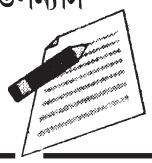# 32

# আরণ্যক

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

## 32.1 প্রস্তাবনা

শহরের হৈচৈ ও আধুনিক জীবনধারায় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দম আটকে আসছিল। শ্রান্ত, ক্লান্ত-মনকে একটু চাঙগা করতে তিনি আন্তরিকভাবে তাঁর জীবিকার বদল চাচ্ছিলেন।

লেখক এখানে সত্যচরণের ভূমিকায়। এক জমিদারির এস্টেটের দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন-পাহাড়ে যাবার সুযোগ পেয়ে গেলেন সত্যচরণ। এখন তিনি লবটুলিয়া-বইহার-আজমাবাদের জঙগলে ঘুরে ঘুরে সেখানকার জ্যোৎস্না, অন্ধকারময় শান্ত স্তব্ধ রাত, রাতের গভীরে জন্তু জানোয়ারের পথ চলার আওয়াজ, সরস্বতী কুণ্ডীর জলে বুনো মহিষের জলপান, পাহাড়-পর্বতে ছেয়ে থাকা জানা-অজানা রঙীন ফুলের বন ইত্যাদি থেকে সব রস শুষে নিয়ে তাজা হয়ে উঠলেন। এখানে মানুষ নয়, প্রকৃতিই প্রধান।

সত্যচরণ পাহাড়-বনে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছেন ; খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতির হাতে গড়ে-ওঠা নর-নারীদের, বনের পশুপাখিদের। অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন তাদের। একটি উপন্যাসের কাঠামোর ফ্রেমে সেই পাহাড়-পর্বত বনজঙগল নদী ঝরনা যেমন ধরেছেন তেমনি ধরেছেন গনোরী, যুগলপ্রসাদ, কুন্তা, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে আর ভানুমতীকে।

লেখকের মনকে আজকের গর্বান্ধ আধুনিক সভ্যতা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এদেশের আসল মালিক এই আদিবাসীদের কাছে। ফিরে দেখার নানা স্মৃতিচারণা করেছেন লেখকের হয়ে সত্যচরণ।

'আরণ্যক' মূল উপন্যাসটিকে এখানে সংক্ষেপিত করা হয়েছে। মূল আলোচ্য ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

এই পাঠে লেখকের ব্যবহৃত বানানরীতি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে অন্যত্র প:ব: বাংলা একাডেমি নির্দেশিত বানান রাখা হয়েছে।

## 32.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পর আপনারা :

- আমাদের দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বহুত্ব সম্বন্ধে পরিচিত হতে পারবেন;
- পূর্ণিয়া জেলার (বর্তমানে বিহার) জঙ্গলমহলের ও সেখানকার আদিবাসীদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন;
- শহুরে সভ্যতার ও আদিবাসীদের সনাতন জীবনধারার তুলনামূলক পরিচয় পাবেন;
- দূষিত ও দূষণমুক্ত পরিবেশকে চিনতে পারবেন;
- গোটা দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন;
- বনজঙ্গল ও সেখানকার জীবজন্তুদের পরিচয় পাবেন।

## 32.3 মূল পাঠ

### অনুবিভাগ - 32.3.1

পনের-ষোল বছর আগেকার কথা। বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরি মিলিল না।

**তাগাদা** = কোনো কাজ করার জন্য বারংবার অনুরোধ।
**ধুমধাম** = জমকাল, আড়ম্বরপূর্ণ।

সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেকদিন ধরিয়া আছি তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে—ধূমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোন কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই। হিন্দু হোস্টেলে জলসার পর অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হইল।

অবিনাশ বলিল—আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে?

**প্রবঞ্চনা** = ছলনা।
**অযাচিতভাবে** = না চাইতেই আপনা থেকে।

কান অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চনা করে জানিতাম। অবিনাশ বলে কি! যে চাকুরির খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরির প্রস্তাব আপনা হইতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল?

**উদাসীন** = নিরপেক্ষ, অনাসক্ত।

তবুও মান বজায় রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সংযমের সহিত মনের ভাব চাপিয়া উদাসীনের মত বলিলাম—ও! আচ্ছা ভেবে বলব। কাল আছ তো?

অবিনাশ খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বলিল—ভাবাভাবি রেখে দাও। আমি বাবাকে
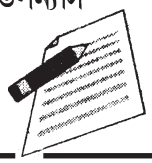
আজই পত্র লিখতে বসছি। আমরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। জমিদারীর ঘুণ কর্মচারী আমরা চাই নে—কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নূতন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়, তোমার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজী হয়ে যাও—আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।

**শব্দার্থ ও টীকা**

**অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার =** নিয়োগ পত্র।

## অনুবিভাগ - 32.3.2

কি করিয়া চাকুরি পাইলাম তাহা বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ এ গল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি—অবিনাশের বাড়ীর চায়ের নিমন্ত্রণ খাইবার দুই সপ্তাহ পরে আমি একদিন নিজের জিনিসপত্র লইয়া বি এন্ ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ছোট স্টেশনে নামিলাম।

**স্বতন্ত্র** = আলাদা, ভিন্ন।

শীতের বৈকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন ছায়া নামিয়াছে, দূরে বনশ্রেণীর মাথায় মাথায় অল্প অল্প কুয়াশা জমিয়াছে। রেল-লাইনের দু-ধারে মটর-ক্ষেত, শীতল সান্ধ্য-বাতাসে তাজা মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে কেমন মনে হইল যে-জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জন হইবে, এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জন, যেমন নির্জন এই উদার প্রান্তর আর ওই দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি।

**সান্ধ্য** = সন্ধ্যাকালীন।

গরুর গাড়ীতে প্রায় পনের-ষোল ক্রোশ চলিলাম সারারাত্রি ধরিয়া—ছইয়ের মধ্যে কলকাতা হইতে আনীত কম্বল র‍্যাগ ইত্যাদি শীতে জল হইয়া গেল—কে জানিত এ-সব অঞ্চলে ভয়ানক শীত! সকালে রৌদ্র যখন উঠিয়াছে, তখনও পথ চলিতেছি। দেখিলাম, জমির প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্য মূর্তি পরিগ্রহন করিয়াছে—ক্ষেতখামার নাই, বস্তি লোকালয়ও বড়-একটা দেখা যায় না—কেবল ছোটোবড় বন, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর, কিন্তু তাহাতে ফসলের আবাদ নাই।

**ক্রোশ** = দু মাইলের কিছু অধিক দীর্ঘপথ-পরিমাণ।

**লোকালয়** = জনবসতি।
**আবাদ** = চাষ।

কাছারিতে পৌঁছিলাম বেলা দশটার সময়। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-পনের বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়া তৈরী—ঘরে শুক্‌নো ঘাস ও বন-ঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া, তাহার উপর মাটি দিয়া লেপা।

ঘরগুলি নতুন তৈরী, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই টাটকা-কাটা খড়, আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আগে জঙ্গলের ওদিকে কোথায় কাছারি ছিল, কিন্তু শীতকালে সেখানে জলাভাব হওয়ায় এই ঘর নতুন বাঁধা হইয়াছে, কারণ পাশেই একটা ঝরণা থাকায় এখানে জলের কষ্ট নাই।

## অনুবিভাগ - 32.3.3

জীবনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, লাইব্রেরী, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা—এসব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরির কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনোদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্বাকাশে সূর্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ সিঁদুরে
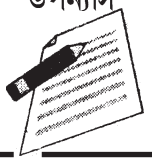
রঙে রাঙাইয়া সূর্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি—ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার-ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ-খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া।

রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সবই ভাবিতেছি, এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া কাছারীর বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন। এই একমাত্র লোক যাহার সহিত বাংলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। গোষ্ঠবাবু এখানে আছেন অন্তত সতের-আঠার বছর। বর্ধমান জেলায় বনপাশ স্টেশনের কাছে কোন্ গ্রামে বাড়ী। বলিলাম বসুন গোষ্ঠবাবু—

গোষ্ঠবাবু অন্য একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম নিরিবিলি, এখানকার কোনও মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলা দেশ নয়। লোকজন সব বড় খারাপ—

—বাংলা দেশের মানুষও সবাই যে খুব ভাল, এমন নয় গোষ্ঠবাবু—

—সে আর আমার জানতে বাকী নেই, ম্যানেজারবাবু। সেই দুঃখে আর ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রথম এখানে আসি। প্রথম এসে বড় কষ্ট হত, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত— আজকাল এমন হয়েছে, দেশ তো দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দু-দিনের বেশী থাকতে পারি নে।

গোষ্ঠবাবুর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিলাম—বলে কি!

জিজ্ঞাসা করিলাম—থাকতে পারেন না কেন? জঙ্গলের জন্য মন হাঁপায় নাকি?

গোষ্ঠবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠিক তাই, ম্যানেজারবাবু। আপনিও বুঝবেন। নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ুউড়ু করছে, বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপর দেখবেন।

—কি দেখব?

—জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভাল লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মোকদ্দমার কাজে— কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।

মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান সে দুরবস্থার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন। তার আগে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কোন্‌কালে কোলকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি!

গোষ্ঠবাবু বলিলেন, বন্দুকটা রাত-বেরাত শিয়রে শিয়রে রেখে শোবেন, জায়গা ভাল নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। তবে আজকাল এখানে আর টাকাকড়ি থাকে না, এই যা কথা।

কৌতূহলের সহিত বলিলাম, বলেন কি! কতকাল আগে ডাকাতি হয়েছিল?

—বেশী না। এই বছর আট-নয় আগে। কিছুদিন থাকুন, তখন সব কথা জানতে পারবেন। এ অঞ্চল বড় খারাপ। তা ছাড়া, এই ভয়ানক জঙ্গলে ডাকাতি করে মেরে দিলে দেখবেই বা কে?

**শব্দার্থ ও টীকা**

**পুরাইব** = কাটাইব।
**মুহুরী** = কেরাণী।
**হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি** = স্বস্তি পাই।
**তাড়না** = অত্যাচার।
**উড়ুউড়ু** = পালাই পালাই।
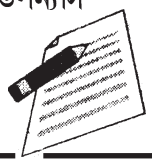
শব্দার্থ ও টীকা

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল, ঠিক যেন জাপানী চিত্রকর হাকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।

চাকুরি করিবার আর জায়গা খুঁজিয়া পাই নাই! এ-সব বিপজ্জনক স্থান, আগে জানিলে কখনই অবিনাশকে কথা দিতাম না।

## অনুবিভাগ - 32.3.4

কাছারির অনতিদূরে একটা ছোট পাথরের টিলা, তার উপর প্রাচীন ও সুবৃহৎ একটা বটগাছ। এই বটগাছের নাম গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ। কেন এই নাম হইল, তখন অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। একদিন নিস্তব্ধ অপরাহ্নে বেড়াইতে বেড়াইতে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের শোভা দেখিতে টিলার উপরে উঠিলাম।

**অনতিদূরে** = অতিরিক্ত দূরে নয়, অল্প দূরে।
**অনুসন্ধান** = খোঁজ
**নিস্তব্ধ** = নিঝুম, নিস্পন্দ।
**অপরাহ্নে** = দিনের শেষ ভাগে, বিকেলে।

টিলার উপরকার বটতলায় আসন্ন সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত দূর পর্যন্ত এক চমকে দেখিতে পাইলাম—কলুটোলার মেস, কপালীটোলার সেই ব্রিজের আড্ডাটি, গোলদীঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চখানা—প্রতিদিন এমন সময়ে যাহাতে গিয়া বসিয়া কলেজ স্ট্রীটের বিরামহীন জনস্রোত ও বাস্ মোটরের ভিড় দেখিতাম। হঠাৎ যেন কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে মনে হইল তাহারা। মন হু-হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্যে-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরির খাতিরে! মানুষ এখানে থাকে? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—একটা কথা কহিবার মানুষ পর্যন্ত নাই। এদেশের এই সব মূর্খ, বর্বর মানুষ,—এরা একটা ভাল কথা বলিলে বুঝিতে পারে না—এদেরই সাহচর্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে? সেই দূরবিসর্পী দিগন্তব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া মন উদাস হইয়া গেল, কেমন ভয়ও হইল। তাই সঙ্কল্প করিলাম, এ মাসের আর সামান্য দিনই বাকী, সামনের মাসটা কোনরূপে চোখ বুঁজিয়া কাটাইব, তার পর অবিনাশকে একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

**বিরামহীন** = বিরতি বা শেষ নেই এমন।

**সাহচর্যে** = সঙ্গে বা সাথে।
**উদাস** = আনমনা।
**দিগন্তব্যাপী** = অনন্তবিস্তারী।
**দূরবিসর্পী** = দূরবিস্তৃত।

কাছারিতে ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলে আলো জ্বালিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছি, সিপাহী মুনেশ্বর সিং আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম—কি মুনেশ্বর?

ইতিমধ্যে দেহাতি হিন্দী কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিলাম।

মুনেশ্বর বলিল—হুজুর, আমায় একখানা লোহার কড়া কিনে দেবার হুকুম যদি দেন মুহুরী বাবুকে।

—কি হবে লোহার কড়া?

মুনেশ্বরের মুখ প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বিনীত সুরে বলিল—একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে
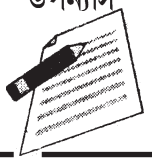
শব্দার্থ ও টীকা



করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কতদিন থেকে ভাবছি একখানা কড়ার কথা—কিন্তু হুজুর, বড় গরীব, একখানা কড়ার দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।

একখানা লোহার কড়াই যে এত গুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোকে রাত্রে স্বপ্ন দেখে, এ ধরনের কথা এই আমি প্রথম শুনিলাম। এত গরীব লোক পৃথিবীতে আছে যে ছ-আনা দামের একখানা লোহার কড়াই জুটিলে স্বর্গ হাতে পায়? শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরীব। এত গরীব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইল।

**চিরকুট** = ছোটো টুকরো।
**হর্ষোৎফুল্ল** = আনন্দে আত্মহারা।
**হো গেল, হুজুরকী কৃপা-সে** = (হিন্দি শব্দ) হয়ে গেল, হুজুরের দয়ায়।

পরদিন আমার সই করা চিরকুটের জোরে মুনেশ্বর সিং নউগচ্ছিয়ার বাজার হইতে একখানা পাঁচ নম্বরের কড়াই কিনিয়া আনিয়া আমার ঘরের মেঝেতে নামাইয়া আমায় সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

—হো গৈল, হুজুরকী কৃপা-সে—কড়াইয়া হো গৈল। তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার এই একমাসের মধ্যে সর্বপ্রথম আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলো! বড় কষ্ট তো এদের!

## অনুবিভাগ - 32.3.5

একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। মনে আছে সেদিন দোল-পূর্ণিমা। কাছারির সিপাহীরা ছুটি চাহিয়া লইয়া সারাদিন ঢোল বাজাইয়া হোলি খেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়েও নাচগানের বিরাম নাই দেখিয়া আমি নিজের ঘরে টেবিলে আলো জ্বালাইয়া অনেক রাত পর্যন্ত হেড আপিসের জন্য চিঠিপত্র লিখিলাম। কাজ শেষ হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত প্রায় একটা বাজে। শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছি। একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে-জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করিল তাহা পূর্ণিমা-নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্না।

**নিশীথিনী** = রাত্রি।
**অবর্ণনীয়** = যার বর্ণনা দেওয়া যায় না।

হয়তো যতদিন আসিয়াছি, শীতকাল বলিয়া গভীর রাত্রে কখনো বাহিরে আসি নাই কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, ফুলকিয়া বইহারের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রির রূপ এই আমি প্রথম দেখিলাম।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই, সিপাহীরা সারাদিন আমোদ- প্রমোদের পরে ক্লান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথরাত্রি। সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটোখাটো বনঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চক্‌চকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব—মন হু হু করিয়া ওঠে, চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথরাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি— মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না। এই সব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরীদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়, আমি অনধিকার-প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

**অর্ধশুষ্ক** = অর্ধেকটা শুকনো।
**অপার্থিব** = অলৌকিক, নৈসর্গিক।
**নিশীথ রাত্রে** = গভীর রাতে।
**অনধিকার** = অধিকার ছাড়া, অধিকার ব্যতীত।

তাহার পর ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নারাত্রি কতবার দেখিয়াছি—ফাল্গুনের মাঝামাঝি যখন দুধ্‌লি ফুল
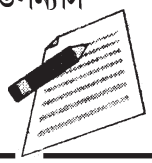
ফুটিয়া সমস্ত প্রান্তরে যেন রঙীন ফুলের গালিচা বিছাইয়া দেয়, তখন কত জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রে বাতাসে দুধ্‌লি ফুলের মিষ্ট সুবাস প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিয়াছি—প্রত্যেক বারেই মনে হইয়াছে জ্যোৎস্না যে এত অপরূপ হতে পারে, মনে এমন ভয়মিশ্রিত উদাস ভাব আনিতে পারে, বাংলা দেশে থাকিতে তাহা তো কোনদিন ভাবিও নাই! ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যলোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না—করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগ্‌দিগন্ত-বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া ওঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত ; যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।

**শব্দার্থ ও টীকা**

**গালিচা** = কার্পেট।
**অপরূপ** = অতুলনীয়।
**দিগ্‌দিগন্ত** = একদিক থেকে আরেক দিক।
**বিসর্পিত** = বিস্তৃত।

## অনুবিভাগ - 32.3.6

সাদা কথায় গ্রীষ্ম বা জলকষ্ট বলিলে এ বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ কিছুই বোঝানো যাইবে না। উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর—পূর্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্যন্ত সারা জঙ্গল-মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল—সব গেল শুকাইয়া। কুয়া খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না—যদিবা বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে, ছোট এক বালতি জল কুয়ায় জমিতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগে। চারিধারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে একমাত্র কুশী নদী ভরসা—সে আমাদের মহালের পূর্বতম প্রান্ত হইতে সাত আট মাইল দূরে বিখ্যাত মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের ওপারে। আমাদের জমিদারী ও মোহনপুরা অরণ্যের মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ী নদী নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে বহিয়া আসিতেছে—কিন্তু বর্তমানে শুধু শুষ্ক বালুময় খাতে তাহার উপলঢাকা চরণচিহ্ন বিদ্যমান। বালি খুঁড়িলে যে জলটুকু পাওয়া যায়, তাহারই লোভে কত দূরের গ্রাম হইতে মেয়েরা কলসী লইয়া আসে ও সারা দুপুর বালি-কাদা ছানিয়া আধ-কলসীটাক ঘোলা জল লইয়া বাড়ী ফিরে।

**বিভীষিকাময়** = ভয়ানক ভীতিপূর্ণ।

**কুণ্ডী** = বড়ো জলাশয়।

**চরণচিহ্ন** = পায়ের ছাপ।

কিন্তু পাহাড়ী নদী—স্থানীয় নাম মিছি নদী—আমাদের কোনও কাজে আসে না—কারণ আমাদের মহাল হইতে বহু দূরে। কাছারিতেও কোন বড় ইঁদারা নাই—ছোট যে বালির পাতকুয়াটি আছে, তাহা হইতে পানীয় জলের সংস্থান হওয়াই বিষম সমস্যার কথা দাঁড়াইল। তিন বাল্‌তি জল সংগ্রহ করিতে দুপুর ঘুরিয়া যায়।

**ইঁদারা** = কুয়ো।
**সংস্থান** = ব্যবস্থা, যোগাড়, সংগ্রহ।

দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে—চারিধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হল্‌কার মত তপ্ত বাতাস সর্বাঙ্গ ঝল্‌সাইয়া বহিতেছে—সূর্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের ও ভয়ানকরুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই। এক এক দিন পশ্চিম দিক হইতে বালির ঝড় বয়—এ সব দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাস পশ্চিমে বাতাসের সময়—কাছারি হইতে এক-শ' গজ দূরের জিনিস ঘন বালি ও ধূলিরাশির আড়ালে ঢাকিয়া যায়।

**তাম্রাভ** = তামার ন্যায় আভা।
**অগ্নিবর্ষী** = আগুন বর্ষণকারী, ভীষণ গরম।

অর্ধেক দিন রামধনিয়া টহলদার আসিয়া জানায়—কুঁয়ামে পানি নেই ছে, হুজুর। কোন-কোন দিন ঘন্টাখানেক ধরিয়া ছানিয়া ছানিয়া বালির ভিতর হইতে আধ বাল্‌তি তরল কর্দম স্নানের জন্য আমার সামনে আনিয়া ধরে। সে ভয়ানক গ্রীষ্মে তাহাই তখন অমূল্য।

**পানি** = জল।
**ছানিয়া ছানিয়া** = ছেঁকে ছেঁকে।
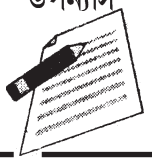
**শব্দার্থ ও টীকা**

**ভীম-ভৈরব** = বিশাল রুদ্রমূর্তি।

**হাইড্রোজেন** = মৌলিক গ্যাস বিশেষ।

**নিকেল/কোবাল্ট** = বিভিন্ন ধাতু।

**ফার্নেস** = অগ্নিকুণ্ড।

একদিন দুপুরের পরে কাছারির পিছনে একটা হরীতকী গাছের তলায় স্বল্প ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ চারিধারে চাহিয়া মনে হইল দুপুরের এমন চেহারা কখনও দেখি তো নাই-ই, এ জায়গা হইতে চলিয়া গেলে আর কোথাও দেখিবও না। আজন্ম বাংলা দেশের দুপুর দেখিয়াছি— জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রভরা দুপুর দেখিয়াছি—কিন্তু এ রুদ্রমূর্তি তাহার নাই। এ ভীম-ভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল। সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড— ক্যাল্‌সিয়াম পুড়িতেছে, হাইড্রোজেন পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে, কোবাল্ট পুড়িতেছে—জানা অজানা শত শত রকমের গ্যাস ও ধাতু কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত দীপ্ত ফার্নেসে একসঙ্গে পুড়িতেছে—তারই ধূ-ধূ আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যের ঈথারেব স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লোধাইটোলার তৃণভূমিতে বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া, প্রতি তৃণপত্রের শিরা উপশিরার সব রসটুকু শুকাইয়া ঝামা করিয়া, দিগ্‌দিগন্ত ঝল্‌সাইয়া পুড়াইয়া শুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডব-লীলা। চাহিয়া দেখিলাম দূরে দূরে প্রান্তরের সর্বত্র কম্পমান তাপ-তরঙ্গ ও তাহার ওধারে তাপজনিত একটি অস্পষ্ট কুয়াশা। গ্রীষ্ম-দুপুরে কখনও এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না—তাম্রাভ, কটা—শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই—পাখির দল দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের!

**কুণ্ডী** = জলাশয়, হ্রদ।

কাছারি হইতে তিন মাইল দূরে একটি বনে-ঘেরা ক্ষুদ্র কুণ্ডীতে সামান্য একটু জল ছিল, কুণ্ডীটাতে গত বর্ষার জলে খুব মাছ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম—খুব গভীর বলিয়া এই অনাবৃষ্টিতেও তাহার জল একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। কিন্তু সে জলে কাহারও কোন কাজ হয় না—প্রথমত, তার কাছাকাছি অনেক দূর লইয়া কোন মানুষের বসতি নাই—দ্বিতীয়ত, জল ও তীরভূমির মধ্যে কাদা এত গভীর যে, কোমর পর্যন্ত বসিয়া যায়—কলসীতে জল পুরিয়া পুনরায় তীরে উত্তীর্ণ হইবার আশা বড়ই কম। আর একটি কারণ এই যে, জলটা খুব ভাল নয়— স্নান বা পানের আদৌ উপযুক্ত নয়, জলের সঙ্গে কি জিনিস মিশানো আছে জানি না— কিন্তু কেমন একটা অপ্রীতিকর ধাতব গন্ধ।

**অপ্রীতিকর** = খারাপ

একদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমে বাতাস ও উত্তাপ কম পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় বাহির হইয়া ঐ কুণ্ডীটার পাশের উঁচু বালিয়াড়ি ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গলের পথে উপস্থিত হইয়াছি। পিছনে গ্র্যাণ্ট সাহেবের সেই বড় বটগাছের আড়ালে সূর্য অস্ত যাইতেছিল। কাছারির খানিকটা জল বাঁচাইবার জন্য ভাবিলাম, এখানে ঘোড়াটাকে একবার জল খাওয়াইয়া লই। যত কাদা হোক, ঘোড়া ঠিক উঠিতে পারিবে। জঙ্গল পার হইয়া কুণ্ডীর ধারে গিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। কুণ্ডীর চারিধারে কাদার উপর আট-দশটা ছোট বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটা প্রকাণ্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে। সাপগুলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত, করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর, যাহা এদেশে সাধারণত দেখা যায়।

মহিষ দেখিয়া মনে হইল, এ ধরনের মহিষ আমি আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং, গায়ে লম্বা লম্বা লোম—বিপুল শরীর। কাছেও কোনও লোকালয় বা মহিষের বাথান নাই—তবে এ মহিষ কোথা হইতে আসিল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, চরির খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কেহ লুকাইয়া হয়ত জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা বাথান করিয়া থাকিবে। কাছারির কাছাকাছি আসিয়াছি, মুনেশ্বর সিং চাক্‌লাদারের সহিত দেখা। তাহাকে কথাটা বলিতেই সে চমকিয়া উঠিল—আরে সর্বনাশ! বলেন কি হুজুর! হনুমানজী খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আজ! ও পোষা ভঁইস্ নয়, ও হ'ল আড়ন, বুনো ভঁইস্ হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গল থেকে

**ভঁইস** = মোষ।

শব্দার্থ ও টীকা

এসেছে জল খেতে। ও অঞ্চলে কোথাও জল নেই তো। জলকষ্টে পড়ে এসেছে।

কাছারিতে কথাটা তখনই রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই এক বাক্যে বলিল—উঃ, হুজুর খুব বেঁচে গিয়েছেন। বাঘের হাতে পড়লে বরং রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, বুনো মহিষের হাতে পড়লে নিস্তার নেই। আর এই সন্ধ্যেবেলা ঐ নির্জন জায়গায় যদি একবার আপনাকে ওরা তাড়া করত, ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁচতে পারতেন না হুজুর।

খবর আসিতে লাগিল সেই জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীতে লোকে বাঘকে জল খাইতে দেখিয়াছে, বন-মহিষকে জল খাইতে দেখিয়াছে, হরিণের পালকে জল খাইতে দেখিয়াছে, নীল গাই ও বুনো শূয়োর তো আছেই—কারণ শেষের দুইপ্রকার জানোয়ার এ জঙ্গলে অত্যন্ত বেশী। আমি নিজে আর একদিন জ্যোৎস্না-রাতে ঘোড়ায় করিয়া কুণ্ডীতে যাই শিকারের উদ্দেশ্যে—সঙ্গে তিন-চারজন সিপাহী ছিল—দু-তিনটি বন্দুকও ছিল। সে যা দৃশ্য দেখিয়াছিলাম সে রাত্রে, জীবনে ভুলিবার নয়। তাহা বুঝিতে হইলে কল্পনায় দৃষ্টি আঁকিয়া লইতে হইবে এক জনহীন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি ও বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের। আরও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে সারা বনভূমি ব্যাপিয়া এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার, অভিজ্ঞতা না থাকিলে যদিও সে নিস্তব্ধতা কল্পনা করা অসম্ভব।

উষ্ণ বাতাস অর্ধশুষ্ক কাশ-ডাঁটার গন্ধে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। লোকালয় হইতে বহুদূরে আসিয়াছি, দিগ্-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কুণ্ডীতে প্রায় নিঃশব্দে জল খাইতেছে একদিকে দুটি নীল গাই, অন্য দিকে দুটি হায়েনা, নীল গাই দুটি একবার হায়েনাদের দিকে চাহিতেছে, হায়েনারা একবার নীল গাই দুটির দিকে চাহিতেছে—আর দু-দলের মাঝখানে দু-তিন মাস বয়সের এক ছোটো নীল গাইয়ের বাচ্চা। অমন করুণ দৃশ্য কখনও দেখি নাই—দেখিয়া পিপাসার্ত বন জন্তুদের নিরীহ শরীরে অতর্কিতে গুলি মারিবার প্রবৃত্তি হইল না।

এদিকে বৈশাখও কাটিয়া গেল। কোথাও একফোঁটা জল নাই। আরো এক বিপদ দেখা দিল। এই সুবিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের মাঝে মাঝে লোকে দিক হারাইয়া আগেও পথ ভুলিয়া যাইত—এখন এই সব পথাহারা পথিকদের জলাভাবে প্রাণ হারাইবার সমূহ আশঙ্কা দাঁড়াইল, কারণ ফুলকিয়া বইহার হইতে গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ পর্যন্ত বিশাল তৃণভূমির মধ্যে কোথাও একবিন্দু জল নাই। এক-আধটা শুষ্কপ্রায় কুণ্ডী যেখানে আছে, অনভিজ্ঞ দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকদের পক্ষে সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়।

## অনুবিভাগ - 32.3.7

একদিনের ঘটনা বলি।

সেদিন বেলা চারটার সময় অত্যন্ত গরমে কাজে মন বসাইতে না পারিয়া একখানা কি বই পড়িতেছি, এমন সময় রামবিরিজ সিং আসিয়া এত্তেলা করিল, কাছারির পশ্চিমদিকে উঁচু ডাঙার উপর একজন কে অদ্ভুত ধরনের পাগলা লোক দেখা যাইতেছে—সে হাত-পা নাড়িয়া দূর হইতে কি যেন বলিতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম সত্যই দূরের ডাঙাটার উপরে কে একজন দাঁড়াইয়া— মনে হইল মাতালের মত টলিতে টলিতে এদিকেই আসিতেছে। কাছারিসুদ্ধ লোক জড় হইয়া সেদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া আমি দুজন সিপাহী

**এত্তেলা** = সংবাদ, খবর।
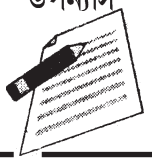
**শব্দার্থ ও টীকা**

**চাকলাদার** = কয়েকটি পরগণার শাসক।

**কথঞ্চিৎ** = কিছুটা।
**প্রবৃত্তি** = ইচ্ছা।

**অনুসন্ধান** = খোঁজ।
**দিগ্‌ভ্রান্ত** = দিক স্থির করতে ব্যর্থ।

**জিনপরী** = অপদেবতা।

**নৈঋত কোণ** = দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ।

পাঠাইয়া দিলাম লোকটাকে এখানে আনিতে।

লোকটাকে যখন আনা হইল, দেখিলাম তাহার গায়ে কোন জামা নাই—পরনে মাত্র একখানা ফর্সা ধুতি, চেহারা ভাল, রং গৌরবর্ণ। কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি অতি ভীষণ, গালের দুই কশ বাহিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখদুটি জবাফুলের মত লাল, চোখে উন্মাদের মত দৃষ্টি। আমার ঘরের দাওয়ায় একটা বালতিতে জল ছিল—তাই দেখিয়া সে পাগলের মত ছুটিয়া বালতির দিকে গেল। মুনেশ্বর সিং চাক্‌লাদার ব্যাপারটা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বালতি সরাইয়া লইল। তাহার পর তাহাকে বসাইয়া হাঁ করাইয়া দেখা গেল জিভ ফুলিয়া বীভৎস ব্যাপার হইয়াছে। অতি কষ্টে জিভটা মুখের এক পাশে সরাইয়া একটু একটু করিয়া তার মুখে জল দিতে দিতে আধ ঘণ্টা পরে লোকটা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কাছারিতে লেবু ছিল, লেবুর রস ও গরম জল এক গ্লাস তাহাকে খাইতে দিলাম। ক্রমে ঘণ্টাখানেক পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। শুনিলাম তার বাড়ী পাটনা। গালার চাষ করিবার উদ্দেশ্যে সে এ-অঞ্চলে কুলের জঙ্গলের অনুসন্ধান করিতে পূর্ণিয়া হইতে রওনা হইয়াছে আজ দুই দিন পূর্বে। তার পর দুপুরের সময় আমাদের মহালে ঢুকিয়াছে, এবং একটু পরে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এ রকম একঘেয়ে একই ধরনের গাছে-ভরা জঙ্গলে দিক্ ভুল করা খুব সোজা, বিশেষত বিদেশী লোকের পক্ষে। ভয়ে দিশাহারা হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিয়াছে আজ সারা দুপুর, তাহার উপর খুব চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবার চেষ্টা করিয়াছে—কোথায় লোক? ফুলকিয়া বইহারের কুলের জঙ্গল যেদিকে, সেদিক হইতে লবটুলিয়া পর্যন্ত দশ-বারো বর্গমাইল-ব্যাপী বনপ্রান্তর সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য, সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাহার চীৎকার কেহ শোনে নাই। আরও তাহার আতঙ্ক হইবার কারণ, সে ভাবিয়াছিল তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে জিনপরীতে পাইয়াছে—মারিয়া না ফেলিয়া ছাড়িবে না। তাহার গায়ে একটা জামা ছিল, কিন্তু আজ অসহ্য পিপাসায় দুপুরের পরে এমন গা-জ্বলুনি শুরু হইয়াছিল যে জামাটা খুলিয়া কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় দৈবক্রমে আমাদের কাছারির হনুমানের ধ্বজার লাল নিশানাটা দূর হইতে তাহার চোখে না পড়িলে লোকটা আজ বেঘোরে মারা পড়িত।

একদিন এই ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিনে ঠিক দুপুর বেলা সংবাদ পাইলাম, নৈঋত কোণে মাইল-খানেক দূরের জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ঝড়ের মুখে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বাঁকা আগুনের শিখা ঠিক যেন ডাক-গাড়ীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের কয়খানা খড়ের বাংলোর দিকেই। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, এখানে থাকিলে আপাতত তো বেড়া-আগুনে ঝলসাইয়া মরিতে হয়—দাবানল তো আসিয়া পড়িল!

ভাবিবার সময় নাই। কাছারির দরকারী কাগজপত্র, তহবিলের টাকা, সরকারী দলিল, ম্যাপ, সর্বস্ব মজুত—এ বাদে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস যার যার তো আছেই। এ সব তো যায়। সিপাহীরা শুষ্কমুখে ভীতকণ্ঠে বলিল—আগ তো আ গৈল, হুজুর! বলিলাম—সব জিনিস বার কর। সরকারী তহবিল ও কাগজপত্র আগে।

জনকতক লোক লাগিয়া গেল আগুন ও কাছারির মধ্যে যে জঙ্গল পড়ে তাহারই যতটা পারা যায় কাটিয়া পরিষ্কার করিতে। জঙ্গলের মধ্যে বাথান হইতে আগুন দেখিয়া বাথানওয়ালা চরির প্রজা দু-দশ জন ছুটিয়া আসিল কাছারি রক্ষা করিতে, কারণ পশ্চিমা বাতাসের বেগ দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে কাছারি ঘোর
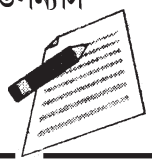
শব্দার্থ ও টীকা

বিপন্ন।

কি অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙিগয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, শিয়াল দৌড়িতেছে, কান উঁচু করিয়া খরগোস দৌড়িতেছে, একদল বন্যশূকর তো ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল —ও অঞ্চলের বাথান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, একঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পালাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ঝাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটাকতক সিল্লি। রামবিরিজ সিং চাকলাদার অবাক হইয়া বলিল—পানি কাঁহা নেই ছে.... আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাসে আয়া, ভাই রামলগন? গোষ্ঠ মুহুরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ বাপু, রাখ্! এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, লাল হাঁস কোথা থেকে এল তার কৈফিয়তে কি দরকার?

আগুন বিশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পরে দশ-পনের জন লোক মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আগুনের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ! জল কোথাও নেই—আধকাঁচা গাছের ডাল ও বালি এইমাত্র অস্ত্র। সকলের মুখচোখ আগুনের ও রৌদ্রের তাপে দৈত্যের মত বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ছাই ও কালি, হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, অনেকেরই গায়ে হাতে ফোস্কা—এদিকে কাছারির সব জিনিসপত্র, বাক্স, খাট, দেরাজ, আলমারি তখনও টানাটানি করিয়া বাহির করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে উঠানে ফেলা হইতেছে। কোথাকার জিনিস যে কোথায় গেল, কে তার ঠিকানা রাখে! মুহুরীবাবুকে বলিলাম—ক্যাশ আপনার জিম্মায় রাখুন, আর দলিলের বাক্সটা।

**বিভীষণ** = অতি-ভয়ঙ্কর।

**জিম্মা** = হেপাজত, সংরক্ষণের দায়িত্ব।

কাছারির উঠান ও পরিষ্কৃত স্থানে বাধা পাইয়া আগুনের স্রোত উত্তর ও দক্ষিণ বাহিয়া নিমেষের মধ্যে পূর্বমুখে ছুটিল—কাছারিটা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গেল এযাত্রা। জিনিসপত্র আবার ঘরে তোলা হইল, কিন্তু বহুদূরে পূর্বাকাশে লাল করিয়া লোলজিহ্বা প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা সারারাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সকালের দিকে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমানায় গিয়া পৌঁছিল।

## অনুবিভাগ - 32.3.8

প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে যেদিন আলাপ হইল, সেদিনটা আমার বেশ মনে হয় আজও। কাছারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি, একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, কিন্তু তাহাতে বৃদ্ধ বলিলে ভুল করা হয়, কারণ তাহার মতো সুগঠিত দেহ বাংলা দেশে অনেক যুবকেরও নাই। কপালে তিলক, গায়ে একখানি সাদা চাদর, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

**সেলামী** = মালিককে সম্মান জানাবার জন্য টাকা দেওয়া।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলিল, সে বহুদূর হইতে আসিতেছে, এখানে কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করিতে চায়। অতি গরীব, জমির সেলামী দিবার ক্ষমতা তাহার নাই, আমি সামান্য কিছু জমি স্টেটের সঙ্গে আধা বখরায় দিতে পারি কিনা?

**বখরা** = ভাগ।

এক ধরণের মানুষ আছে, নিজের সম্বন্ধে বেশি কথা বলিতে জানে না, কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয় যে, সত্যই বড় দুঃখী। রাজু পাঁড়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল এ অনেক আশা করিয়া
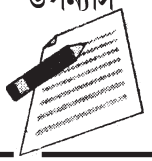
শব্দার্থ ও টীকা



ধরমপুর পরগণা হইতে এতদূর আসিয়াছে জমির লোভে, জমি না পাইলে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া যাইবে বটে, কিন্তু বড়ই আশাভঙ্গ ও ভরসাহারা হইয়া ফিরিবে।

রাজুকে দু-বিঘা জমি লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বন্দোবস্ত দিলাম, একরকম বিনামূল্যেই। বলিয়া দিলাম, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সে আবাদ করুক, প্রথমে দু বৎসর কিছু লাগিবে না, তৃতীয় বৎসর হইতে চার আনা বিঘাপিছু খাজনা দিতে হইবে। তখনও বুঝি নাই কি অদ্ভুত ধরণের মানুষকে জমিদারীতে বসাইলাম!

রাজু আসিল ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে, জমি পাইয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা বহু কাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম। পর বৎসর শীতের শেষে হঠাৎ একদিন লবটুলিয়া কাছারি হইতে ফিরিতেছি, দেখি একটি গাছতলায় কে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া লোকটি বই মুড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি চিনিলাম, সেই রাজু পাঁড়ে। কিন্তু আর-বছর জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পর লোকটা একবারও কাছারিমুখো হল না, এর মানে কি? বলিলাম— কি রাজু পাঁড়ে, তুমি আছ এখানে? আমি ভেবেছি তুমি জমি ছেড়ে-ছুড়ে চলে গিয়েছ বোধ হয়। চাষ করনি?

দেখিলাম, ভয়ে রাজুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আমতা আমতা করিয়া বলিল— হ্যাঁ হুজুর, চাষ কিছু— এবার হুজুর—

আমার কেমন রাগ হইয়া গেল। এই সব লোকের মুখ বেশ মিষ্টি, লোক ঠকাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ আদায় করিতে বেশ পটু। বলিলাম— দেড় বছর তোমার চুলের টিকি তো দেখা যায়নি। দিব্যি স্টেট্‌কে ঠকিয়ে ফসল ঘরে তুলছ— কাছারির ভাগ দেওয়ার যে কথা ছিল, তা বোধ হয় তোমার মনে নেই?

রাজু এবার বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল— ফসল হুজুর? কিন্তু সে তো ভাগ দেবার কথা আমার মনেই ওঠেনি— সে চীনা ঘাসের দানা—

কথাটা বিশ্বাস হইল না। বলিলাম— চীনার দানা খাচ্ছ এই ছ-মাস? অন্য ফসল নেই? কেন মকাই করনি?

না হুজুর, বড্ড গজার জঙ্গল। একা মানুষ, ভরসা করে উঠতে পারিনি। পনের কাঠা জমি অতিকষ্টে তৈরি করেছি। আসুন না হুজুর, একবার দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে যান।

রাজুর পিছনে পিছনে গেলাম। এত ঘন জঙ্গল মাঝে মাঝে যে, ঘোড়ার ঢুকিতে কষ্ট হইতেছিল। খানিক দূরে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে গোলাকার পরিষ্কার জায়গা বিঘাখানেক, মাঝখানে জংলী ঘাসেরই তৈরি ছোট নীচু দুখানা খুপরি। একখানাতে রাজু থাকে, আর একখানায় তার ক্ষেতের ফসল জমা আছে। থলে কি বস্তা নাই, মাটির নীচু মেঝেতে রাশীকৃত চীনা ঘাসের দানা স্তূপীকৃত করা। বলিলাম— রাজু, তুমি এত আল্‌সে কুঁড়ে লোক তা তো জানতুম না, দেড় বছরের মধ্যে দু-বিঘের জঙ্গল কাটতে পারলে না?

রাজু ভয়ে ভয়ে বলিল— সময় হুজুর বড় কম যে!

— কেন, কি কর সারাদিন?
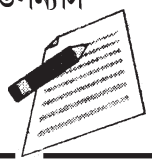
শব্দার্থ ও টীকা

রাজু লাজুক মুখে চুপ করিয়া রহিল। রাজুর বাসস্থান খুপরির মধ্যে জিনিসপত্রের বাহুল্য আদৌ নাই। একটা লোটা ছাড়া অন্য তৈজস চোখে পড়িল না। লোটাটা বড়গোছের,তাতেই ভাত রান্না হয়। ভাত নয়, চীনা ঘাসের বীজ। কাঁচা শালপাতায় ঢালিয়া সিদ্ধ চীনার বীজ খাইলে তৈজসপত্রের কি দরকার? জলের জন্য নিকটেই কুণ্ডী অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। আর কি চাই?

কিন্তু খুপরির একধারে সিঁদুরমাখানো ছোট কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণমূর্তি দেখিয়া বুঝিলাম, রাজু ভক্তমানুষ! ক্ষুদ্র পাথরের বেদী বনের ফুলে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বেদীর একপাশে দু-একখানা পুঁথি ও বই। অর্থাৎ, তাহার সময় নাই মানে সে সারাদিন পূজাআচ্চা লইয়াই বোধ হয় ব্যস্ত থাকে। চাষ করে কখন?

এই রাজুকে প্রথম বুঝিলাম।

রাজু পাঁড়ে হিন্দী লেখাপড়া ভাল জানে, সংস্কৃতও সামান্য জানে। তাও সে সর্বদা পড়ে না, মাঝে মাঝে অবসর সময়ে গাছতলায় কি একখানা হিন্দী বই খুলিয়া একটু বসে— অধিকাংশ সময় দূরের আকাশ ও পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। একদিন দেখি একটা ছোট খাতায় খাগের কলমে, বসিয়া কি লিখিতেছে। ব্যাপার কি? পাঁড়ে কবিতাও লেখে নাকি?

রাজু কথার জবাব প্রথমটা দিলে না। তারপর বলিল— জীবনের সময়টাই বড় কম হুজুর। জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বনজঙ্গল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখি ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে। সেখানে ওঁরা তাকান না। কাজেই এখানে, দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন— কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।

দেখিলাম রাজু কবি বটে, দার্শনিকও বটে।

সেবার শুয়োরমারির বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল। কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। একদিন শুনিলাম, রাজু পাঁড়ে সেখানে চিকিৎসা করিতে বাহির হইয়াছে। রাজু পাঁড়ে যে চিকিৎসক তাহা জানিতাম না। তবে আমি কিছুদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম বটে, ভাবিলাম এই সব ডাক্তার কবিরাজশূন্য স্থানে দেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারি। কাছারি হইতে আমার সঙ্গে আরও অনেকে গেল। গ্রামে পৌঁছিয়া রাজু পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হইল। সে একটা বাটুয়াতে শিকড়-বাকড় জড়ি-বুটি লইয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমায় নমস্কার করিয়া বলিল— হুজুর আপনার বড্ড দয়া, আপনি এসেছেন, এবার লোকগুলো যদি বাঁচে। এমন ভাবটা দেখাইল যেন আমি জেলার সিবিল সার্জেন কিংবা ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী। সে-ই আমাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে রোগীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল।

রাজু ওষুধ দেয়, সবই দেখিলাম ধারে। সারিয়া উঠিলে দাম দিবে এই নাকি কড়ার হইয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা



## অনুবিভাগ - 32.3.9

কয়েক বারের কথা বলি। সে অমূল্য অনুভূতিরাজির কথা বলিতে গেলে লিখিয়া পাতার পর পাতা ফুরাইয়া যায়, কিন্তু তবু বলা শেষ হয় না, যা বলিতে চাহিতেছি তাহার অনেকখানিই বাকি থাকিয়া যায়। এসব শুনিবার লোকও সংখ্যায় অত্যন্ত কম, ক'জন মনে-প্রাণে প্রকৃতিকে ভালবাসে?

**দুধলি ঘাস** = একপ্রকার ঘাস।

অরণ্য-প্রান্তরে লবটুলিয়ার মাঠে মাঠে দুধ্‌লি ঘাসের ফুল ফুটাইয়া জানাইয়া দেয় যে বসন্ত পড়িয়াছে। সে ফুলও বড় সুন্দর, দেখিতে নক্ষত্রের মত আকৃতি, রং হলদে, লম্বা লম্বা সরু লতার মত ঘাসের ডাঁটাটা অনেকখানি জমি জুড়িয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকে, নক্ষত্রাকৃতি হলদে ফুল ধরে তার গাঁটে গাঁটে। ভোরে মাঠ, পথের ধার সর্বত্র আলো করিয়া ফুটিয়া থাকিত—কিন্তু সূর্যের তেজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সব ফুল কুঁক্‌ড়াইয়া পুনরায় কুঁড়ির আকার ধারণ করিত—পরদিন সকালে আবার সেই কুঁড়িগুলিই দেখিতাম ফুটিয়া আছে।

**মহালিখারূপ শৈল** = মহালিখারূপ নামক পাহাড়।

রক্তপলাশের বাহার আছে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে ও আমাদের সীমানার বাহিরের জঙ্গলে কিংবা মহালিখারূপের শৈলসানুপ্রদেশে। আমাদের মহাল হইতে সে-সব স্থান অনেক দূরে, ঘোড়ায় তিন-চার ঘণ্টা লাগে। সে-সব জায়গায় চৈত্রে শালমঞ্জরীর সুবাসে বাতাস মাতাইয়া রাখে, শিমূল বনে দিগন্তরেখা রাঙাইয়া দেয়, কিন্তু কোকিল, দোয়েল, বৌ-কথা-কও প্রভৃতি গায়ক পাখীরা ডাকে না, এ-সব জনহীন অরণ্য-প্রান্তরের যে ছন্ন-ছাড়া রূপ, বোধহয় তাহারা তাহা পছন্দ করে না।

এক-এক দিন বাংলাদেশে ফিরিবার জন্য মন হাঁপাইয়া উঠিত, বাংলা দেশের পল্লীর সে সুমধুর বসন্ত কল্পনায় দেখিতাম, মনে পড়িত বাঁধানো পুকুরঘাটে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে গমনরতা কোন তরুণী বধূর ছবি, মাঠের ধারে ফুলফোটা ঘেটুবন, বাতাবীলেবুর ফুলের সুগন্ধে মোহময় ঘন-ছায়া-ভরা অপরাহ্ন। দেশকে কী ভাল করিয়াই চিনিলাম বিদেশে গিয়া! দেশের জন্য এই মনোবেদনা দেশে থাকিতে কখনও অনুভব করি নাই, জীবনে এ একটা বড় অনুভূতি, যে ইহার আস্বাদ না পাইল, সে হতভাগ্য একটা শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সহিত অপরিচিত রহিয়া গেল।

**রহস্যময়** = আশ্চর্যজনক।
**অসীমতার** = সীমার বাঁধনে যা বাঁধা যায় না।
**দুরধিগম্যতার** = দুর্গমত্বের।
**ভয়াল** = ভীতিপ্রদ।
**নিস্পৃহ** = নিরাসক্ত।

কিন্তু যে-কথাটা বার-বার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনো বারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম-ছম-করানো সৌন্দর্যের দিকটা। না দেখিলে কি করিয়া বুঝাইব সে কী জিনিস!

জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ ঝাউবন ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নর-নারীর বেদনার রূপে।

সে-রূপ তাহার না দেখাই ভাল, যাহাকে ঘরদুয়ার বাঁধিয়া সংসার করিতে হইবে। প্রকৃতির সে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে।

গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ-ধূ জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্যে পাগল হইতে হয়—একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না—আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে-রূপ না দেখাই ভাল, সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল

সামলানো বড় কঠিন।

তবে একথাও ঠিক, প্রকৃতিকে সে-রূপে দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার। এমন বিজন বিশাল উন্মুক্ত আরণ্য-প্রান্তর, শৈলমালা, বনঝাউ আর কাশের বন কোথায় যেখানে-সেখানে? তার সঙ্গে যোগ চাই গভীর নিশীথিনীর নীরবতার ও তার অন্ধকার বা জ্যোৎস্নার—এত যোগাযোগ সুলভ হইলে পৃথিবীতে কবি আর পাগলে দেশ ছাইয়া যাইত না?

একদিন প্রকৃতির সে-রূপ কিভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সে ঘটনা বলি।

পূর্ণিয়া হইতে উকিলের 'তার' পাইলাম পরদিন সকাল দশটার মধ্যে আমায় সেখানে হাজির হইতে হইবে। অন্যথায় স্টেটের একটা বড় মোকদ্দমায় আমাদের হার সুনিশ্চিত।

আমাদের মহাল হইতে পূর্ণিয়া পঞ্চান্ন মাইল দূরে। রাত্রের ট্রেন মাত্র একখানি, যখন 'তার' হস্তগত হইল তখন সতের মাইল দূরবর্তী কাটারিয়া স্টেশনে গিয়া সে-ট্রেন ধরা অসম্ভব।

ঠিক হইল এখনই ঘোড়ায় রওনা হইতে হইবে।

কিন্তু পথ সুদীর্ঘ বটে, বিপদসঙ্কুলও বটে, বিশেষ করিয়া এই রাত্রিকালে, এই আরণ্য- অঞ্চলে। সুতরাং তহশীলদার সৃজন সিং আমার সঙ্গে যাইবে ইহাও ঠিক হইল।

সন্ধ্যায় দুজনে ঘোড়া ছাড়িলাম। কাছারি ছাড়িয়া জঙ্গল পড়িতেই কিছু পরে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ উঠিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় বন-প্রান্তর আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। পাশাপাশি দু'জনে চলিয়াছি —আমি আর সুজন সিং। পথ কখনও উঁচু, কখনও নীচু, সাদা বালির উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে। ঝোপঝাপ মাঝে মাঝে, আর শুধু কাশ আর ঝাউবন চলিয়াছে, সুজন সিং গল্প করিতেছে। জ্যোৎস্না ক্রমেই ফুটিতেছে—বনজঙ্গল, বালুচর ক্রমশ স্পষ্টতর হইতেছে। বহুদূর পর্যন্ত নীচু জঙ্গলের শীর্ষদেশ একটানা সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ-ধূ প্রান্তর একদিকে, অন্য দিকে জঙ্গল। বাঁ দিকে দূরে অনুচ্চ শৈলমালা। নির্জন, নীরব, মানুষের বসতি কুত্রাপি নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেন অন্য কোন অজানা গ্রহের মধ্যে নির্জন বনপথে দুটি মাত্র প্রাণী আমরা।

এক জায়গায় সুজন সিং ঘোড়া থামাইল। ব্যাপার কি? পাশের জঙ্গল হইতে একটি ধাড়ী বন্যশূকর একদল ছানাপোনা লইয়া আমাদের পথ পার হইয়া বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকিতেছে। সুজন সিং বলিল—তবুও ভাল হুজুর, ভেবেছিলাম বুনো মহিষ। মোহনপুরা জঙ্গলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, বুনো মহিষের ভয় এখানে খুব। সেদিনও একজন লোক মারিয়াছে মহিষে।

আরও কিছুদূর গিয়া জ্যোৎস্নায় দূর হইতে কালোমত সত্যই কি একটা দেখা গেল।

সুজন বলিল—ঘোড়া ভয় পাবে হুজুর, ঘোড়া রুখুন।

কাশের মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, রাস্তা বলিয়া কিছু নাই, এই কাশের ঝুঁটি দেখিয়া এই গভীর জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া লইতে হয়। একবার সুজন সিং বলিল —হুজুর, এ-পথটা যেন নয়, পথ ভুলেছি আমরা।

**শব্দার্থ ও টীকা**

**বিজন** = জনহীন।
**উন্মুক্ত** = খোলা।

**বিপদসঙ্কুল** = বিপদ্‌জনক।
**তহশীলদার** = খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

**অনুচ্চ** = বেশি উঁচু নয়।
**শৈলমালা** = পর্বতশ্রেণী।
**কুত্রাপি** = কোথাও।
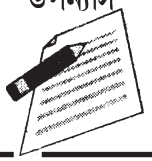
আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিয়া ধ্রুবতারা ঠিক করিলাম—পূর্ণিয়া আমাদের মহাল হইতে খাড়া উত্তরে, তবে ঠিকই আছে, সুজনকে বুঝাইয়া বলিলাম।

সুজন বলিল—না হুজুর, কুশীনদীর খেয়া পেরুতে হবে যে, খেয়া পার হয়ে তবে সোজা উত্তরে যেতে হবে। এখন উত্তর-পূর্ব কোণ কেটে বেরুতে হবে।

অবশেষে পথ মিলিল।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে—সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনও দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা! এমন উন্মুক্ত আকাশ-তলে ছায়াহীন উদাস গভীর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না—ক'জন দেখিয়াছে? উঃ, সে কি ছুট! পাশাপাশি চলিতে চলিতে দুই ঘোড়াই হাঁপাইতেছে, শীতেও ঘাম দেখা দিয়াছে আমাদের গায়ে।

সামনের পাহাড়ের পিছন থেকে টকটকে লাল সিঁদুরের গোলার মত সূর্য উঠিতেছে। পথের ধারে এক গ্রামে ঘোড়া থামাইয়া কিছু দুধ কিনিয়া দুজনে খাইলাম। পরে আরো ঘণ্টা-দুই চলিয়াই পূর্ণিয়া শহর।

পূর্ণিয়া স্টেটের কাজ তো শেষ করিলাম, সে যেন নিতান্ত অন্যমনস্কতার সহিত, মন পড়িয়া রহিল পথের দিকে। আমার সঙ্গীর ইচ্ছা, সে কাজ শেষ করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে—আমি তাহাকে বাধা দিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে এতটা পথ অশ্বারোহণে যাইবার বিচিত্র সৌন্দর্যের পুনরাস্বাদনের লোভে!

## অনুবিভাগ - 32.3.10

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের তিনদিকে নিবিড় বন। এ ধরনের বন আমাদের মহালে বা লবটুলিয়াতে নাই। এ বনে বড় বড় বনস্পতিদের নিবিড় সমাবেশ—জলের সান্নিধ্য-বশতই হোক বা যে-জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা, বন্যপুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতীর কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্বদিকে বহুদূর-প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। সুতরাং পূর্ব-পশ্চিম কোণের তীরের কোনো এক জায়গায় বসিয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে চাহিয়া দেখিলে সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্য্যের অপূর্বতা ঠিক বোঝা যায়। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে, দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটি হইতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

এখানে একখানা শিলাখণ্ডের উপর কতদিন গিয়া একা বসিয়া থাকিতাম। কখনও বনের মধ্যে দুপুরবেলা আপন মনে বেড়াইতাম। কত বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করিতাম। এখানে যত রকমের পাখীর ডাক শোনা যায়, আমাদের মহালে অত পাখী নাই।

**শব্দার্থ ও টীকা**

**সপ্তর্ষি** = মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, গুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষিশ্রেষ্ঠ।

**সপ্তর্ষিমণ্ডল** = সপ্তর্ষি নামে খ্যাত নক্ষত্র সমূহের সমবায়।

**অন্যমনস্কতা** = মনোযোগহীনতা।

**পুনরাস্বাদন** = আবার উপভোগের আস্বাদন।

**কুণ্ডী** = জলাশয়, হ্রদ।

**নিবিড়** = ঘন।

**বনস্পতি** = বড়ো বড়ো গাছ।

**সান্নিধ্য** = নিকট।

**শৈলমালা** = পর্বতশ্রেণী।

**কুজন** = পাখীর ডাক।

শব্দার্থ ও টীকা

নানা রকমের বন্য ফল খাইতে পায় বলিয়া এবং সম্ভবত উচ্চ বনস্পতিশিরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ ঘটে বলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বনে ফুলও অনেক রকমের ফোটে।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপর বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। কত ধরনের কত নব অনুভূতি মনে আসিয়া জোটে। এক প্রকার অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা ধীরে ধীরে গভীর অন্তস্তল হইতে বাহিরের মনে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এ আসে গভীর আনন্দের মূর্তি ধরিয়া। প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।

**অতিমানস** = অধিক মানবিক চেতনা।
**অন্তস্তল** = হৃদয়ের ভেতর থেকে।
**হৃৎস্পন্দন** = হৃদয়ের স্পন্দন।

আমাদের যেখানে মহাল, সেখানে পাখীর এত বৈচিত্র্য নাই। সেখানটা যেন অন্য জগৎ,তার গাছপালা জীবজন্তু অন্য ধরনের। পরিচিত জগতে বসন্ত যখন দেখা দিয়াছে, লবটুলিয়ায় তখন একটা কোকিলের ডাক নাই, একটা পরিচিত বসন্তের ফুল নাই। সে যেন রুক্ষ কর্কশ ভৈরবী মূর্তি ; সৌম্য, সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্যহীন মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল বর্জিত খাড়ব সুর, মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দার ধার মাড়াইয়া চলে না—সুরের গম্ভীর উদ্দাত্ত রূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

সরস্বতী কুণ্ডী সেখানে ঠুংরী, সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে। স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতে শুনিতে মন কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধ নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সেখান হইতে উঠিয়া আসিতাম।

**আর্দ্র** = ভেজা।

নাঢ়া বইহার জরীপ হইতেছে প্রজাদের মধ্যে বিলির জন্য, আমীনদের কাজ দেখাইবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইতে হয়। ফিরিবার পথে মাইল দুই পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটু ঘুরিয়া যাই, শুধু সরস্বতী কুণ্ডীর এই বনভূমিতে ঢুকিয়া বনের ছায়ায় খানিকটা বেড়াইবার লোভে।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম—প্রান্তরসীমা হইতে জলের কিনারা প্রায় দেড় মাইলের কম নয়, কোনো কোনো স্থানে আরও বেশি। একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমন ভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। হাত-দুই উপরেই গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি একপ্রকার বন্যলতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে—একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের উপর দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোটো যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন নিবিড় সুবাস সে-ফুলের! ঝোপের নিভৃত তল ভারাক্রান্ত সেই অজানা বনপুষ্পের সুবাসে।
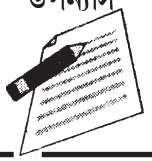
**শব্দার্থ ও টীকা**

**আড্ডা** = মিলনস্থল।

**ভ্রূক্ষেপ** = গ্রাহ্য করা।

**অসঙ্কোচ** = সঙ্কোচহীন।
**সঞ্চরণ** = চলাফেরা।

**নির্বাক** = বাক্‌শূন্য, বাক্যহারা।
**নিস্পন্দ** = স্পন্দনহীন, স্থির হয়ে থাকা।
**সাগ্রহ** = আগ্রহের সঙ্গে।
**চকিত** = একটুখানি।

**জ্ঞাপন করিতেছে** = জানাচ্ছে।

পূর্বেই বলিয়াছি সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও আছে এখানকার বনে। কত ধরনের কত রং-বেরঙের পাখী—শ্যামা, শালিক, হরটিট্, বনটিয়া, ফেজান্ট-ক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখী, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখী—পাখীর কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাস-ভরা অবাক কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারি পাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ্ কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

পাখীদের এই অসঙ্কোচ সঞ্চরণ আমার বড় ভাল লাগিত। উঠিয়া বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় পায় না, একটু উড়িয়া গেল, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পালায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে বকিতে বকিতে আবার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

এখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। জানিতাম বন্য হরিণ আমাদের মহালের জঙ্গলে আছে, কিন্তু এর আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতায় জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ-বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে, এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব!

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্বাক, নিস্পন্দ।

আধ মিনিট পরে হরিণ-শিশুটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আবার একটু আগাইয়া আসিল। তার চোখে ঠিক যেন মনুষ্যশিশুর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কিনা জানি না, আমার ঘোড়াটা সে-সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা-ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

তার পর কতক্ষণ ঝোপের তলায় বসিয়া রহিলাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জল অর্ধচন্দ্রাকারে দূর শৈলমালার পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত, আকাশ নীল, মেঘের লেশ নেই কোনো দিকে—কুণ্ডীর জলচর পাখীর দল ঝগড়া, কলরব, তুমুল দাঙ্গা শুরু করিয়াছে—একটা গম্ভীর ও প্রবীণ মানিক-পাখী তীরবর্তী এক উচ্চ বনস্পতির শীর্ষে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। জলের ধারে ধারে বড় বড় গাছের মাথায় বকের দল এমন ঝাঁক বাঁধিয়া আছে, দূর হইতে মনে হয় যেন সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছে।

রোদ ক্রমশঃ রাঙা হইয়া আসিল।

ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল।

পাখীর কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্নের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেঁজি খানিকদূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে
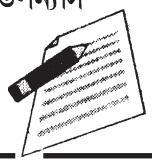
শব্দার্থ ও টীকা

চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিন ঘণ্টার কম নয়—বন্য পাখীর কাকলী ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখীদের পায়ে পায়ে ডালপাতার মচ্‌মচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুকরো পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোনো দিকে।

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে কত বন্য শিউলি গাছ—শিউলি গাছের প্রাচুর্য এক এক জায়গায় এত বেশি, যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর শরতের প্রথমে সকালবেলা রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল—দীর্ঘ এক রকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশে- পাশে—বড় বড় ময়না-কাঁটার গাছ তার সঙ্গে জড়াইয়াছে—কাঁটা, ঘাস, শিলাখণ্ড সব-তাতেই রাশি রাশি শিউলি ফুল—আর্দ্র ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম! লোকে বলে সরস্বতী কুণ্ডীর জঙ্গলে বাঘ আছে, জ্যোৎস্না-রাত্রে সরস্বতীর বিস্তৃত জলরাশির কৌমুদীস্নাত শোভা দেখিবার লোভে রাসপূর্ণিমার দিন তহশীলদার বনোয়ারীলালের চোখে ধূলা দিয়া আজমাবাদের সদর কাছারি আসিবার ছুতায় লবটুলিয়া ডিহি কাছারি হইতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় এখানে আসিয়াছি।

শ্রাবণ মাসে একদিন আমাকে উত্তর সীমানার জরীপের ক্যাম্পে রাত্রি যাপন করিতে হয়। আমার সঙ্গে ছিল আমীন রঘুবর প্রসাদ। সে আগে গবর্ণমেন্টের চাকুরি করিয়াছে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও এ-অঞ্চলের বনের সঙ্গে তার পঁচিশ-ত্রিশ-বছরের পরিচয়।

**জরীপ** = মাপজোক।
**গবর্ণমেন্ট** = সরকার।

তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী-পরীরা নামে ; জ্যোৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐ সব পাথরের উপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে আছে। আমি দেখি নি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-তাঁবুতে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তার একটা কান খেয়ে ফেলেছিল। হুজুর, ওখানে আপনি ও-রকম যাবেন না।

**লাস** = মৃতদেহ।

এই সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে একদিন দুপুরে এক অদ্ভুত লোকের সন্ধান পাইলাম।

সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার পথে একদিন হ্রদের তীরের বনপথ দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছি, বনের মধ্যে দেখি একটি লোক মাটি খুঁড়িয়া কি যেন করিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম লোকটা ভুঁই-কুমড়া তুলিতে আসিয়াছে। ভুঁই-কুমড়া লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটির মধ্যে লতার নীচে চালকুমড়ার আকারের প্রকাণ্ড কন্দ জন্মায়—উপর হইতে বোঝা যায় না। কবিরাজী ঔষধে লাগে বলিয়া বেশ দামে বিক্রি হয়। কৌতূহলবশতঃ ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছে গেলাম, দেখি ভুঁই- কুমড়া নয়, কিছু নয়, লোকটা কিসের যেন বীজ পুঁতিয়া দিতেছে।

**ভুঁই-কুমড়া** = লতাজাতীয় উদ্ভিদ।

আমায় দেখিয়া সে থতমত খাইয়া অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বয়স হইয়াছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সঙ্গে একটা চটের থলি, তার ভিতর হইতে ছোটো একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা

**থতমত খাইয়া** = ঘাবড়ে যাওয়া।
**অপ্রতিভ** = অপ্রস্তুত, হতবুদ্ধি।

**শব্দার্থ ও টীকা**

যাইতেছে, একটা শাবল পাশে পড়িয়া, ইতস্তত কতকগুলি কাগজের মোড়ক ছড়ানো।

বলিলাম—তুমি কে? এখানে কি করছ?

সে বলিল—হুজুর কি ম্যানেজারবাবু?

—হ্যাঁ। তুমি কে?

—নমস্কার। আমার নাম যুগলপ্রসাদ। আমি আপনাদের লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই।

**চাচাতো ভাই** = কাকার ছেলে।

তখন আমার মনে পড়িল, বনোয়ারী পাটোয়ারী একবার কথায় কথায় তাহার চাচাতো ভাইয়ের কথা তুলিয়াছিল।

বনোয়ারী বলিয়াছিল—তার নানা বাতিক হুজুর, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না, বিয়ে-সাদি করেছে, সংসার দেখে না, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়, ওই এক ধরনের মানুষ।

এই তাহা হইলে বনোয়ারীলালের সেই চাচাতো ভাই?

কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম—ও কি পুঁতছ ওখানে?

লোকটা বোধ হয় গোপনে কাজটা করিতেছিল, যেন ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে এমন সুরে বলিল—কিছু না, এই—একটা গাছের বীজ—

আমি আশ্চর্য হইলাম। কি গাছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কি গাছের বীজ ছড়াইতেছে—তাহার সার্থকতাই বা কি? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিল—অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগানে ভারী চমৎকার বিলিতি লতা—বেশ রাঙা রাঙা ফুল! তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতা-ফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে।

**ব্যয়** = খরচ।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে-বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা!

যুগলপ্রসাদকে ডাকিয়া এক গাছের তলায় দুজনে বসিলাম। সে বলিল—আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর, লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ও-সব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে।

—তোমার কি এ কাজ খুব ভাল লাগে?

—লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারী চমৎকার জায়গা—ওই সব ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কি
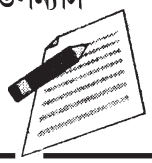
এখানকার বনে ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাব, এ আমার বহুদিনের শখ।

—কি ফুল নিয়ে আসতে?

—কি করে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হুজুরকে বলি। আমার বাড়ি ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডীর ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশীনদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ-পনেরো ক্রোশ দূরে। সেখানে দেখতাম বনে-জঙ্গলে, মাঠে বুনো ভাণ্ডীর ফুলের বড় শোভা। সেখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, এখন আমাদের অঞ্চলের পথের ধারে বনঝোপে কি লোকের বাড়ীর পেছনে পোড়ো জমিতে ভাণ্ডী ফুলের একেবারে জঙ্গল ; সেই থেকে আমার এইদিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল, গাছ, লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারাজীবন ওই করে ঘুরেছি। এখন আমি ও-কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।

যুগলপ্রসাদ দেখিলাম এদেশের বহু বনের ফুল ও সুদৃশ্য বৃক্ষলতার খবর রাখে। এ বিষয়ে সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বলিলাম—তুমি এরিস্টলোকিয়া লতা চেন?

তাহাকে ফুলের গড়ন বলিতেই সে বলিল, হংস-লতা? হাঁসের-মত-চেহারার ফুল হয় তো? ও তো এদেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।

তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারীই বা ক'টা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরীব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।

আমায় বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর মত চমৎকার বন এ অঞ্চলে কোথাও নেই বাবুজী। কত গাছপালা যে আছে, আর কি দেখেছেন জলের শোভা! আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন এতে পদ্ম হবে পুঁতে দিলে? ধরমপুরের পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদ্ম আছে অনেক পুকুরে। ভাবছিলাম গেঁড় এনে পুঁতে দেব।

আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইচ্ছা আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিল। যুগলপ্রসাদ খাইতে পায় না, সংসারে বড় কষ্ট, ইহা আমি জানিতাম। সদরে লিখিয়া তাহাকে দশ টাকা বেতনে একটা মুহুরীর চাকুরি দিলাম আজমাবাদ কাছারিতে।

সেই বছরে আমি কলিকাতা হইতে সাটনের বিদেশী বন্য পুষ্পের বীজ আনিয়া ও ডুয়ার্সের পাহাড় হইতে বন্য জুঁইয়ের লতার কাটিং আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রোপণ করিলাম সরস্বতী হ্রদের বনভূমিতে। কি আহ্লাদ ও উৎসাহ যুগলপ্রসাদের! আমি তাহাকে শিখাইয়া দিলাম এ উৎসাহ ও আনন্দ যেন সে কাছারির লোকের কাছে প্রকাশ না করে। তাহাকে তো লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না। পর বৎসর বর্ষার জলে আমাদের রোপিত গাছ ও লতার ঝাড় অদ্ভুতভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হ্রদের তীরের জমি অত্যন্ত উর্বর, গাছপালাগুলিও যাহা পুঁতিয়াছিলাম, এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। হলদে ধুতুরা-জাতীয় এক প্রকার গাছ হ্রদের ধারে ধারে পুঁতিয়াছিলাম। খুব শীঘ্রই তাহার ফুল ফুটিল। যুগলপ্রসাদ পূর্ণিয়ার জঙ্গল হইতে বন্য বয়ড়া লতার বীজ আনিয়াছিল, চারা বাহির হইবার সাত মাসের মধ্যেই দেখি কাছাকাছি অনেক ঝোপের মাথা

**শব্দার্থ ও টীকা**

**ভাণ্ডীর** = বটগাছ ; ভাঁট বা ঘেঁটু গাছ।

**এরিস্টলোকিয়া** = হংস লতা, একপ্রকার লতা।

**অক্লান্ত** = ক্লান্তহীন।

**গেঁড়** = গ্রন্থিযুক্ত মূল।

**আহ্লাদ** = আনন্দ, হর্ষ, আমোদ।

বয়ড়া লতায় ছাইয়া যাইতেছে। বয়ড়া লতার ফুল যেমন সুদৃশ্য, তেমনি তাহার মৃদু সুবাস।

হেমন্তের প্রথমে একদিন দেখিলাম বয়ড়া লতায় অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে।

যুগলপ্রসাদকে খবরটা দিতেই সে কলম ফেলিয়া আজমাবাদ কাছারি হইতে সাত মাইল দূরবর্তী সরস্বতী হ্রদের তীরে প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতেই আসিল।

আমায় বলিল—লোকে বলেছিল হুজুর, বয়ড়া লতা জন্মাবে, বাড়বেও বটে, কিন্তু ওর ফুল ধরবে না। সব লতায় নাকি ফুল ধরে না। দেখুন কেমন কুঁড়ি এসেছে!

হ্রদের জলে 'ওয়াটার ক্রোফ্‌ট্' বলিয়া এক প্রকার জলজ ফুলের গেঁড় পুঁতিয়াছিলাম। সে গাছ হু হু করিয়া এত বাড়িতে লাগিল যে, যুগলপ্রসাদের ভয় হইল জলে পদ্মের স্থান বুঝি ইহারা বেদখল করিয়া ফেলে!

বোগেনভিলিয়া লতা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শহরের শৌখীন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে এতই ওর সম্পর্কটা জড়ানো যে আমার ভয় হইল সরস্বতী কুণ্ডীর বনে ফুলেভরা বোগেনভিলিয়ার ঝোপ ইহার বন্য আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যুগলপ্রসাদেরও এসব বিষয়ে মত আমার ধরনের। সেও বারণ করিল।

অর্থব্যয়ও কম করি নাই। একদিন গনোরী তেওয়ারীর মুখে শুনিলাম, কারো নদীর ওপারে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের বন্যপুষ্প হয়—ওদেশে তার নাম দুধিয়া ফুল। হলুদ গাছের মত পাতা, অত বড়ই গাছ—খুব লম্বা একটা ডাঁটা ঠেলিয়া উঁচুদিকে তিন-চার হাত ওঠে। একটা গাছে চার-পাঁচটা ডাঁটা হয়, প্রত্যেক ডাঁটায় চারটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ধরে—দেখিতে খুব ভাল তো বটেই, ভারি সুন্দর তার সুবাস। রাত্রে অনেক দূর পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়। সে ফুলের একটা গাছ যেখানে একবার জন্মায়, দেখিতে দেখিতে এত হু হু বংশবৃদ্ধি হয় যে, দু-তিন বছরে রীতিমত জঙ্গল বাঁধিয়া যায়।

শুনিয়া পর্যন্ত আমার মনের শান্তি নষ্ট হইল। ঐ ফুল আনিতেই হইবে। গনোরী বলিল, বর্ষাকাল ভিন্ন হইবে না ; গাছের গেঁড় আনিয়া পুঁতিতে হয়—জল না পাইলে মরিয়া যাইবে।

পয়সা-কড়ি দিয়ে যুগলপ্রসাদকে পাঠাইলাম। সে বহু অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল হইতে দশ-বারো গণ্ডা গেঁড় যোগাড় করিয়া আনিল।

## অনুবিভাগ - 32.3.11

পনের-দিন এখানে একেবারে বন্য-জীবন যাপন করিলাম, যেমন থাকে গাঙ্গোতারা কি গরীব ভুঁইহার বামুনরা। ইচ্ছা করিয়া নয়, অনেকটা বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইল এ ভাবে। এ জঙ্গলে কোথা হইতে কি আনাইব? খাই ভাত ও বন-ধুঁধুলের তরকারি, বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আলু তুলিয়া আনে সিপাহীরা, তাই ভাজা বা সিদ্ধ। মাছ দুধ ঘি—কিছু নাই।

অবশ্য বনে সিল্লি ও ময়ূরের অভাব ছিল না, কিন্তু পাখী মারিতে তেমন যেন মন সরে না বলিয়া বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিরামিষই খাইতে হইত।
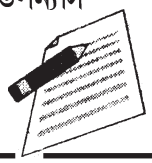
শব্দার্থ ও টীকা

ফুলকিয়া বইহারে বাঘের ভয় আছে। একদিনের ঘটনা বলি।

হাড়ভাঙা শীত সেদিন। রাত দশটার পরে কাজকর্ম মিটাইয়া সকাল সকাল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, হঠাৎ কত রাত্রে জানি না, লোকজনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিল। জঙ্গলের ধারের কোন্ জায়গায় অনেকগুলি লোক জড় হইয়া চীৎকার করিতেছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলাম। আমার সিপাহীরা পাশের খুপরি হইতে বাহির হইয়া আসিল। সবাই মিলিয়া ভাবিতেছি ব্যাপারটা কি, এমন সময়ে একজন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—ম্যানেজারবাবু বন্দুকটা নিয়ে শীগগির চলুন—বাঘে একটা ছোটো ছেলে নিয়ে গিয়েছে খুপরি থেকে।

জঙ্গলের ধার হইতে মাত্র দু-শ' হাত দূরে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ডোমন বলিয়া একজন গাঙ্গোতা প্রজার একখানা খুপরি। তাহার স্ত্রী ছ-মাসের শিশু লইয়া খুপরির মধ্যে শুইয়াছিল— অসম্ভব শীতের দরুন খুপরির মধ্যেই আগুন জ্বালানো ছিল, এবং ধোঁয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য ঝাঁপটা একটু ফাঁক ছিল। সেই পথে বাঘ ঢুকিয়া ছেলেটিকে লইয়া পলাইয়াছে।

কি করিয়া জানা গেল বাঘ? শিয়ালও তো হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া আর কোনো সন্দেহ রহিল না, ফসলের নরম মাটিতে স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ।

আমার পাটোয়ারী ও সিপাহীরা মহালের অপবাদ রটিতে দিতে চায় না, তাছাড়া জোর গলায় বলিতে লাগিল—এ আমাদের বাঘ নয় হুজুর, এ মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের বাঘ। দেখুন না কত বড় থাবা!

যাহাদেরই বাঘ হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। বলিলাম, সব লোক জড় কর, মশাল তৈরী কর—চল জঙ্গলের মধ্যে দেখি। সেই রাত্রে অত বড় বাঘের পায়ের সদ্য থাবা দেখিয়া ততক্ষণে সকলেই ভয়ে কাঁপিতে শুরু করিয়াছে—জঙ্গলের মধ্যে কেহ যাইতে রাজী নয়। ধমক ও গালমন্দ দিয়া জন-দশেক লোক জুটাইয়া মশাল হাতে টিন পিটাইতে পিটাইতে সবাই মিলিয়া জঙ্গলের নানা স্থানে বৃথা অনুসন্ধান করা গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় মাইল-দুই দূরে দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় আসান-গাছের তলায় শিশুটির রক্তাক্ত দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইল।

কৃষ্ণপক্ষের কি ভীষণ অন্ধকার রাত্রিগুলিই নামিল তাহার পরে!

আমার কাশের খুপরির দরজার কাছেই সিপাহীরা খুব আগুন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে উঠিয়া তাহাতে কাঠ ফেলিয়া দিই। পাশের খুপরিতে সিপাহীরা কথাবার্তা বলিতেছে—খুপরির মেঝেতেই শুইয়া আছি, মাথার কাছের ঘুলঘুলি দিয়া দেখা যাইতেছে ঘন অন্ধকারে-ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে ক্ষীণ তারার আলোয় পরিদৃশ্যমান জঙ্গলের আবছায়া সীমারেখা। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল, যেন মৃত নক্ষত্রলোক হইতে তুষারবর্ষী হিমবাতাস তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর দিকে—লেপ-তোশক হিমে ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছে, আগুন নিবিয়া আসিতেছে, কি দুরন্ত শীত! আর সেই সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরের অবাধ হু-হু তুষারশীতল নৈশ হাওয়া!

কিন্তু কি করিয়া থাকে এখানকার লোকেরা এই শীতে, এই আকাশের তলায় সামান্য কাশের খুপরির ঠাণ্ডা মেঝের উপর কি করিয়া রাত্রি কাটায়? তাহার উপর ফসল চৌকি দিবার এই কষ্ট, বন্য-মহিষের উপদ্রব, বন্য-শূকরের উপদ্রব কম নয়—বাঘও আছে। আমাদের বাংলা দেশের চাষীরা কি এত কষ্ট করিতে পারে? অত

**উন্মুক্ত** = খোলা।
**তুষারশীতল** = বরফের মতো ঠাণ্ডা।

**উপদ্রব** = জ্বালাতন, অত্যাচার।
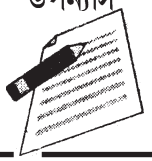
উর্বর জমিতে, অত নিরুপদ্রব গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ফসল করিয়াও তাহাদের দুঃখ ঘোচে না।

আমার ঘরের দু-তিন-শ' হাত দূরে দক্ষিণ ভাগলপুর হইতে আগত কয়েকজন কাটুনী মজুর স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল কাটিতে আসিয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় তাহাদের খুপরির কাছ দিয়া আসিবার সময় দেখি কুঁড়ের সামনে বসিয়া সবাই আগুন পোহাইতেছে।

এদের জগৎ আমার কাছে অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত। ভাবিলাম, সেটা দেখি না কেমন!

গিয়া বলিলাম—বাবাজী, কি করা হচ্ছে?

একজন বৃদ্ধ ছিল দলে, তাহাকেই এই সম্বোধন। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে সেলাম করিল, বসিয়া আগুন পোহাইতে অনুরোধ করিল। ইহা এদেশের প্রথা। শীতকালে আগুন পোহাইতে আহ্বান করা ভদ্রতার পরিচয়।

গিয়া বসিলাম। খুপরির মধ্যে উঁকি দিয়া দেখি বিছানা বা আসবাবপত্র বলিতে ইহাদের কিছু নাই। কুঁড়েঘরে মেঝেতে মাত্র কিছু শুক্‌নো ঘাস বিছানো। বাসনকোসনের মধ্যে খুব বড় একটা কাঁসার জামবাটি আর একটা লোটা। কাপড় যার যা পরনে আছে—আর এক টুকরো বস্ত্রও বাড়তি নাই। কিন্তু তাহা তো হইল, এই নিদারুণ শীতে ইহাদের লেপ-কাঁথা কই? রাত্রে গায়ে দেয় কি?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৃদ্ধের নাম নক্‌ছেদী ভকত। জাতি গাঙোগোতা। সে বলিল—কেন, খুপরির কোণে ঐ যে কলাইয়ের ভূষি দেখছেন না রয়েছে টাল করা?

বুঝিতে পারিলাম না। কলাইয়ের ভূষির আগুন করা হয় রাত্রে?

নক্‌ছেদী আমার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিল।

—তা নয় বাবুজী। কলাইয়ের ভূষির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে, আমরাও কলাইয়ের ভূষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই। দেখছেন না, অন্তত পাঁচ মণ ভূষি মজুত রয়েছে। ভারী ওম্ কলাইয়ের ভূষিতে। দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম্ হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল বলুন না?

বলিতে বলিতে একটা ছোটো ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মা খুপরির কোণের ভূষির গাদার মধ্যে তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত ঢুকাইয়া কেবলমাত্র মুখখানা বাহির করিয়া শোওয়াইয়া রাখিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিলাম, মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? কখনও কি জানিতাম এসব কথা? আজ যেন সত্যিকারের ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।

অগ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে বসিয়া একটি মেয়ে কি রাঁধিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি রান্না হচ্ছে?

নক্‌ছেদী বলিল—ঘাটো।

—ঘাটো কি জিনিস?

**শব্দার্থ ও টীকা**

**অনাবিষ্কৃত** = যা আবিষ্কার হয়নি।
**অজ্ঞাত** = অজানা।

**জামবাটি** = বড়ো ধরনের বাটি।

**ভূষি** = শষ্যের খোসা বা চোকলা।

**ঘাটো** = মকাই সেদ্ধকে ঘাটো বলে।
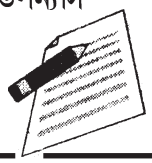
এবার বোধ হয় রন্ধনরতা মেয়েটি ভাবিল, এ বাংগালী বাবু সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। এ দেখিতেছি নিতান্ত বাতুল। কিছুই খোঁজ রাখে না দুনিয়ার। সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ঘাটো জানো না বাবুজী? মকাই-সেদ্ধ। যেমন চাল সেদ্ধ হ'লে বলে ভাত, মকাই সেদ্ধ করলে বলে ঘাটো।

দিন পনেরোর মধ্যে ফুলকিয়া বইহারের চেহারা বদলাইয়া গেল। সরিষার গাছ শুকাইয়া মাড়িয়া বীজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ছাপরা প্রভৃতি স্থান হইতে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা দাঁড়িপাল্লা ও বস্তা লইয়া আসিল মাল কিনিতে। তাদের সঙ্গে কুলির ও গাড়োয়ানের কাজ করিতে আসিল এক দল লোক। হালুইকররা আসিয়া অস্থায়ী কাশের ঘর তুলিয়া মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া সতেজে পুরী, কচৌরী, লাড্ডু, কালাকন্দ্ বিক্রয় করিতে লাগিল। ফিরিওয়ালারা নানা রকম সস্তা ও খেলো মনোহারী জিনিস, কাচের বাসন, পুতুল, সিগারেট, ছিটের কাপড়, সাবান ইত্যাদি লইয়া আসিল।

এ বাদে আসিল রং-তামাশা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিতে কত ধরনের লোক। নাচ দেখাইতে, রামসীতা সাজিয়া ভক্তের পূজা পাইতে, হনুমানজীর সিঁদুরমাখা মূর্তি হাতে পাণ্ডাঠাকুর আসিল প্রণামী কুড়াইতে। এ সময় সকলেরই দু-পয়সা রোজগারের সময় এসব অঞ্চলে।

আর বছরও যে জনশূন্য ফুলকিয়া বইহারের প্রান্তর ও জঙ্গল দিয়া, বেলা পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় যাইতেও ভয় করিত—এ বছর তাহার আনন্দোৎফুল্ল মূর্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। চারিদিকে বালক-বালিকার হাস্যধ্বনি, কলরব, সস্তা টিনের ভেঁপুর পিঁপিঁ বাজনা, ঝুমঝুমির আওয়াজ, নাচিয়েদের ঘুঙুরের ধ্বনি—সমস্ত ফুলকিয়ার বিরাট প্রান্তর জুড়িয়া যেন একটা বিশাল মেলা বসিয়া গিয়াছে।

লোকসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে অত্যন্ত বেশি। কত নতুন খুপরি, কাশের লম্বা চালাঘর চারিদিকে রাতারাতি উঠিয়া গেল। ঘর তুলিতে এখানে কোন খরচ নাই, জঙ্গলে আছে কাশ ও বনঝাউ কি কেঁদ-গাছের গুঁড়ি ও ডাল! শুকনো কাশের ডাঁটায় খোলা পাকাইয়া এদেশে একরকম ভারি শক্ত রশি তৈরি করে, আর আছে ওদের নিজেদের শারীরিক পরিশ্রম।

ফুলকিয়ার তহশীলদার আসিয়া জানাইল, এই সব বাহিরের লোক, যাহারা এখানে পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছে, ইহাদের কাছে জমিদারের খাজনা আদায় করিতে হইবে।

বলিল—আপনি রীতিমত কাছারি করুন হুজুর, আমি সব লোক একে একে আপনার কাছে হাজির করাই—আপনি ওদের মাথাপিছু একটা খাজনা ধার্য ক'রে দিন।

কত রকমের লোক দেখিবার সুযোগ পাইলাম এই ব্যাপারে!

সকাল হইতে দশটা পর্যন্ত কাছারি করিতাম, বৈকালে আবার তিনটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

তহশীলদার বলিল—এরা বেশী দিন এখানে থাকবে না, ফসল মাড়া ও বেচাকেনা শেষ হয়ে গেলেই সব পালাবে। এর আগে এদের পাওনা আদায় ক'রে নিতে হবে।

একদিন মুনেশ্বর সিং আসিয়া জানাইল, একজন লোক জমিদারের খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে

**শব্দার্থ ও টীকা**

**বাতুল** = উন্মাদ, ক্ষেপা।

**মকাই-সেদ্ধ** = ঘাটো।

**কালাকন্দ্** = সন্দেশ বিশেষ।

**রশি** = দড়ি।

**খাজনা** = রাজস্ব, জমিদারের প্রাপ্য কর।
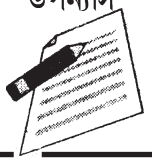
**শব্দার্থ ও টীকা**

**দুবৃত্ত** = দুশ্চরিত্র, দুষ্টুস্বভাব, দুরাত্মা।

**কুঞ্চিত** = সংশোধিত।
**বুভুক্ষু** = ক্ষুধিত।

**তল্পিতপ্পা** = বিছানাপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের গাঁটরি।

**মোলায়েম** = নরম, কোমল।

**বাভন** = ব্রাহ্মন।

পলাইতেছে—হুকুম হয় তো ধরিয়া আনে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—পালাচ্ছে কি রকম? দৌড়ে পালাচ্ছে?

—ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে হুজুর, এতক্ষণ বড় কুণ্ডী পার হয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে পৌঁছল।

দুর্বৃত্তকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচজন সিপাহী পলাতক আসামীকে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

লোকটাকে দেখিয়া আমার মুখে কথা সরিল না। তাহার বয়স ষাটের কম কোনোমতেই হইবে বলিয়া আমার তো মনে হইল না—মাথার চুল সাদা, গালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে কতকাল বুভুক্ষু ছিল, এইবার ফুলকিয়া বইহারের খামারে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে।

শুনিলাম সে নাকি 'ননীচোর নাটুয়া' সাজিয়া আজ কয়দিনে বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছে, গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের তলায় একটা খুপরিতে থাকিত, আজ কয়দিন ধরিয়া সিপাহীরা তাহার কাছে খাজনার তাগাদা করিতেছে, কারণ এদিকে ফসলের সময়ও ফুরাইয়া আসিল। আজ তাহার খাজনা মিটাইবার কথা ছিল। হঠাৎ দুপুরের পরে সিপাহীরা খবর পায় সে লোকটা তল্পিতল্পা বাঁধিয়া রওয়ানা হইয়াছে। মুনেশ্বর সিং ব্যাপার কি জানিতে গিয়া দেখে যে আসামী বইহার ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে পূর্ণিয়া অভিমুখে—মুনেশ্বরের হাঁক শুনিয়া সে নাকি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার পরই এই অবস্থা।

সিপাহীদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে কিন্তু আমার সন্দেহ জন্মিল। প্রথমত 'ননীচোর নাটুয়া' মানে যদি বালক শ্রীকৃষ্ণ হয়, তবে ইহার সে সাজিবার বয়স আর আছে কি? দ্বিতীয়ত, এ লোকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছিল, এ কথাই বা কি করিয়া সম্ভব!

কিন্তু উপস্থিত সকলেই হলফ করিয়া বলিল—উভয় কথাই সত্য।

তাহাকে কড়া সুরে বলিলাম—তোমার এ দুর্বুদ্ধি কেন হ'ল, জমিদারের খাজনা দিতে হয় জান না? তোমার নাম কি?

লোকটা ভয়ে বাতাসের মুখে তালপাতার মত কাঁপিতেছিল। আমার সিপাহীরা একে চায় তো আরে পায়, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। তাহারা যে এই বৃদ্ধ নটের প্রতি খুব সদয় ও মোলায়েম ব্যবহার করে নাই ইহার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে দেরি হইল না।

লোকটা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, তাহার নাম দশরথ।

—কি জাত? বাড়ী কোথায়?

—আমরা ভুঁইহার বাভন হুজুর। বাড়ী মুঙ্গের জেলা—সাহেবপুর কামাল।

—পালাচ্ছিলে কেন?

—কই না, পালাব কেন, হুজুর?

—বেশ, খাজনা দাও।
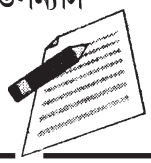
শব্দার্থ ও টীকা

—কিছুই পাই নি, খাজনা দেব কোথা থেকে? নাচ দেখিয়ে সর্ষে পেয়েছিলাম, তা বেচে ক'দিন পেটে খেয়েছি। হনুমানজীর কিরিয়া।

সিপাহীরা বলিল—সব মিথ্যে কথা। শুনবেন না হুজুর। ও অনেক টাকা রোজগার করেছে। ওর কাছেই আছে। হুকুম করেন তো ওর কাপড়চোপড় সন্ধান করি।

লোকটা ভয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর, আমি বলছি আমার কাছে কত আছে।

পরে কোমর হইতে একটা গেঁজে বাহির করিয়া উপুড় করিয়া ঢালিয়া বলিল—এই দেখুন হুজুর, তের আনা পয়সা আছে। আমার কেউ নেই, এই বুড়ো বয়সে কে-ই বা আমায় দেবে? আমি নাচ দেখিয়ে এই ফসলের সময় খামারে খামারে বেড়িয়ে যা রোজগার করি। আবার সেই গমের সময় পর্যন্ত এতেই চালাব ; তার এখনও তিন মাস দেরি। যা পাই পেটে দুটো খাই, এই পর্যন্ত। সিপাহীরা বলছে, আমায় নাকি আট আনা খাজনা দিতে হবে—তা হলে আমার আর রইল মোটে পাঁচ আনা। পাঁচ আনায় তিন মাস কি খাব?

বলিলাম—তোমার হাতে ও পোঁটলাতে কি আছে? বার কর।

লোকটা পোঁটলা খুলিয়া দেখাইল তাহাতে আছে ছোট্ট একখানা টিনমোড়া আর্সি, একটা রাংতার মুকুট—ময়ূরপাখা সমেত, গালে মাখিবার রং, গলায় পরিবার পুঁতির মালা ইত্যাদি— কৃষ্ণঠাকুর সাজিবার উপকরণ।

আর্সি = আয়না।

বলিল—দেখুন তবুও বাঁশী নেই হুজুর। একটা টিনের বড় বাঁশী আট আনার কম হবে না। এখানে নলখাগড়ার বাঁশীতে কাজ চালিয়েছি। এরা গাঙেগাতা জাত, এদের ভুলানো সহজ। কিন্তু আমাদের মুঙ্গের জেলায় লোক সব বড় এলেমদার। বাঁশী না হ'লে হাসবে। কেউ পয়সা দেবে না।

আমি বলিলাম—বেশ, তুমি খাজনা দিতে না পার, নাচ দেখিয়ে যাও, খাজনার বদলে।

বৃদ্ধ হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছে এমন ভাব দেখাইল। তাহার পর গালেমুখে রং মাখিয়া ময়ূরপাখা মাথায় ঐ বয়সে সে যখন বারো বছরের বালকের ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—তখন হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিতে পারিলাম না।

আমার সিপাহীরা তো মুখে কাপড় দিয়া বিদ্রূপের হাসি চাপিতে প্রাণপণ করিতেছে। তাহাদের চক্ষে 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ এক মারাত্মক ব্যাপারে পরিণত হইল। বেচারীরা ম্যানেজারবাবুর সামনে না পারে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, না পারে দুর্দমনীয় হাসির বেগ সামলাইতে।

বিদ্রূপ = ঠাট্টা, ব্যঙ্গ।
মারাত্মক = ভয়ানক।

নাচ শেষ হইল। আমি হাততালি দিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

বলিলাম—এমন নাচ কখনও দেখি নি, দশরথ। বড় চমৎকার নাচো। আচ্ছা তোমার খাজনা মাপ করে দিলাম—আর আমার নিজ থেকে এই দু টাকা বখশিশ দিলাম খুশি হয়ে। ভারি চমৎকার নাচ।

আর দিন-দশ-বারোর মধ্যে ফসল কেনাবেচা শেষ হইয়া গেলে বাড়তি লোক সব যে যার দেশে চলিয়া গেল। রহিল মাত্র যাহারা এখানে জমি চষিয়া বাস করিতেছে তাহারাই। দোকান- পসার উঠিয়া গেল, নাচওয়ালা,
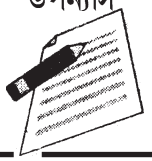
ফিরিওয়ালারা অন্যত্র রোজগারের চেষ্টায় গেল। কাটুনি জনমজুরের দল এখনও পর্যন্ত ছিল শুধু এই সময়ের আমোদ তামাশা দেখিবার জন্য—এইবার তাহারাও বাসা উঠাইবার যোগাড় করিতে লাগিল।

নক্‌ছেদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপালে হাত দিয়া আমায় সেলাম করিল। বলিল—ও মঞ্চী, বাবুজীকে বসবার একটা কিছু পেতে দে।

নক্‌ছেদীর খুপরিতে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আছে, সে যে নক্‌ছেদীর স্ত্রী তাহা অনুমান করা কিছু শক্ত নয়। কিন্তু সে প্রায়ই বাহিরের কাজকর্ম অর্থাৎ কাঠ ভাঙা, কাঠ কাটা, দূরবর্তী ভীমদাসটোলার পাতকুয়া হইতে জল আনা ইত্যাদি লইয়া থাকে। মঞ্চী সেই মেয়েটি, যে আমাকে বুনো হাতীর গল্প বলিয়াছিল। সে আসিয়া শুষ্ক কাশের ডাঁটায় বোনা একখানা চেটাই পাতিয়া দিল।

তার সেই দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী 'ছিকাছিকি' বুলির সুন্দর টানের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন দেখলেন বাবুজী বইহারের মেলা? বলেছিলাম না, কত নাচ-তামাশা-আমোদ হবে, কত জিনিস আসবে, দেখলেন তো? অনেক দিন আসেন নি বাবুজী, বসুন। আমরা যে শীগগির চলে যাচ্ছি।

ওদের খুপরির দোরের কাছে লম্বা আধশুকনো ঘাসের উপর চেটাই পাতিয়া বসিলাম, যাহাতে সূর্যাস্তটা ঠিক সামনাসামনি দেখিতে পাই। চারিদিকের জঙ্গলের গায়ে একটা মৃদু-রাঙা আভা পড়িয়াছে, একটা আকর্ষণীয় শান্তি ও নীরবতা বিশাল বইহার জুড়িয়া।

নাচ-তামাশা কেমন দেখলেন বাবু? বেশ ভাল ভাল লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। একদিন ঝল্লুটোলায় বড় বকাইন গাছের তলায় একটা লোক মুখে ঢোলক বাজিয়েছিল, শুনেছিলেন? কি চমৎকার বাবুজী! দেখিলাম মঞ্চী নিতান্ত বালিকার মতই নাচ-তামাশায় আমোদ পায়। এবার কত রকম কি দেখিয়াছে, মহা উৎসাহ ও খুশির সুরে তাহারই বর্ণনা করিতে বসিয়া গেল।

নক্‌ছেদী বলিল—নে নে, বাবুজী কলকাতায় থাকেন, তোর চেয়ে অনেক কিছু দেখেছেন। ও এ-সব বড় ভালবাসে বাবুজী, ওরই জন্যে আমরা এতদিন এখানে রয়ে গেলাম। ও বল্লে—না, দাঁড়াও, খামারের নাচ-তামাশা, লোকজন দেখে তবে যাব। বড্ড ছেলেমানুষ এখনও!

মঞ্চী যে নক্‌ছেদীর কে হয় তাহা এতদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, যদিও ভাবিতাম বৃদ্ধের মেয়েই হইবে। আজ ওর কথায় আমার আর কোনো সন্দেহ রহিল না।

বলিলাম—তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কোথায়?

নক্‌ছেদী আশ্চর্য হইয়া বলিল—আমার মেয়ে! কোথায় আমার মেয়ে হুজুর?

—কেন, এই মঞ্চী তোমার মেয়ে নয়?

আমার কথায় সকলের আগে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল মঞ্চী। নক্‌ছেদীর প্রৌঢ়া স্ত্রীও মুখে আঁচল চাপা দিয়া খুপরির ভিতর ঢুকিল।

নক্‌ছেদী অপমানিত হওয়ার সুরে বলিল—মেয়ে কি হুজুর! ও যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী!

বলিলাম—ও!

## শব্দার্থ ও টীকা

**অনুমান** = আন্দাজ।
**দূরবর্তী** = দূরে অবস্থিত।

**মৃদু** = অল্প, সামান্য।

অতঃপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি তো এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম যে, কথা খুঁজিয়া পাই না।

## অনুবিভাগ - 32.3.13

শব্দার্থ ও টীকা

এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল।

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনের-কুড়ি দূরে একটা বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গল সেবার কালেক্টরীর নীলামে ডাক হইবে খবর পাওয়া গেল। আমাদের হেড আপিসে তাড়াতাড়ি একটা খবর দিতে তারযোগে আদেশ পাইলাম, বিড়ির পাতার জঙ্গল যেন আমি ডাকিয়া লই।

কিন্তু তাহার পূর্বে জঙ্গলটা একবার আমার নিজের চোখে দেখা আবশ্যক। কি আছে না-আছে না জানিয়া নীলাম ডাকিতে আমি প্রস্তুত নই। এদিকে নীলামের দিনও নিকটবর্তী, 'তার' পাওয়ার পরদিনই সকালে রওনা হইলাম।

আমার সঙ্গের লোকজন খুব ভোরে বাক্স-বিছানা ও জিনিসপত্র মাথায় রওনা হইয়াছিল, মোহনপুরা ফরেস্টের সীমানায় কারো নদী পার হইবার সময়ে তাহাদের সহিত দেখা হইল। সঙ্গে ছিল আমাদের পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল।

কারো ক্ষীণকায়া পার্বত্য স্রোতস্বিনী—হাঁটুখানেক জল ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া উপলরাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। আমরা দুজনে ঘোড়া হইতে নামিলাম, নয়ত পিছল পাথরের নুড়িতে ঘোড়া পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। দু-পারে কটা বালির চড়া। সেখানেও ঘোড়ায় চাপা যায় না,— হাঁটু পর্যন্ত বালিতে এমনিই ডুবিয়া যায়। অপর পারের কড়ারী জমিতে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা এগারটা। বনোয়ারী পাটোয়ারী বলিল—এখানে রান্নাবান্না করে নিলে হয় হুজুর, এর পরে জল পাওয়া যায় কি না ঠিক নেই।

**ক্ষীণকায়া** = সরু।
**স্রোতস্বিনী** = নদী।

নদীর দু-পারেই জনহীন আরণ্যভূমি, তবে বড় জঙ্গল নয়, ছোটোখাটো কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল—খুব ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, লোকজনের চিহ্ন কোন দিকে নাই।

আহারাদির কাজ খুব সংক্ষেপে সারিলেও সেখান হইতে রওনা হইতে একটা বাজিয়া গেল।

বেলা যখন যায়-যায়, তখনও জঙ্গলের কুলকিনারা নাই, আমার মনে হইল আর বেশি দূর অগ্রসর না হইয়া একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া ভাল। অবশ্য বনের মধ্যে ইহার পূর্বে দুইটি বন্য গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়াছি—একটার নাম কুলপাল, একটার নাম বুরুডি, কিন্তু সে প্রায় বেলা তিনটার সময়। তখন যদি জানা থাকিত যে, সন্ধ্যার সময়ও জঙ্গল শেষ হইবে না তাহা হইলে সেখানেই রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করা যাইত।

বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে জঙ্গল বড় ঘন হইয়া আসিল। আগে ছিল ফাঁকা জঙ্গল, এখন যেন ক্রমেই চারিদিক হইতে বড় বড় বনস্পতির দল ভিড় করিয়া সরু সুঁড়িপথটা চাপিয়া ধরিতেছে—এখন যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেখানটাতে তো চারিদিকেই বড় বড় গাছ, আকাশ দেখা যায় না, নৈশ অন্ধকার ইতিমধ্যেই ঘনাইয়া আসিয়াছে।

**বনস্পতি** = বড়ো বড়ো গাছ।
**নৈশ** = রাত্রি।

এক এক জায়গায় ফাঁকা জঙ্গলের দিকে বনের কি অনুপম শোভা! কি এক ধরনের থোকা থোকা সাদা
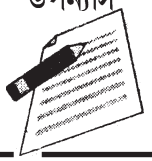
শব্দার্থ ও টীকা



ফুল সারা বনের মধ্যে আলো করিয়া ফুটিয়া আছে ছায়াগহন অপরাহ্নের নীল আকাশের তলে। মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা হইতে বহু দূরে এত সৌন্দর্য কার জন্য যে সাজানো! বনোয়ারী বলিল—ও বুনো তেউড়ির ফুল, এই সময় জঙ্গলে ফোটে, হুজুর। এক রকমের লতা।

যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গাছের মাথা, ঝোপের মাথা, ঈষৎ নীলাভ শুভ্র বুনো তেউড়ির ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে—ঠিক যেন রাশি রাশি পেঁজা নীলাভ কাপাস তুলা কে ছড়াইয়া রাখিয়াছে বনের গাছের মাথায় সর্বত্র। ঘোড়া থামাইয়া মাঝে মাঝে কতক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছি—এক এক জায়গার শোভা এমনই অদ্ভুত যে সেদিকে চাহিয়া যেন একটা ছন্নছাড়া মনের ভাব হইয়া যায়—যেন মনে হয়, কত দূরে কোথায় আছি, সভ্য জগৎ হইতে বহু দূরে এক জনহীন অজ্ঞাত জগতের উদাস, অপরূপ বন্য সৌন্দর্যের মধ্যে—যে জগতের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই, প্রবেশের অধিকারও নাই, শুধু বন্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতার জগৎ।

**অজ্ঞাত** = অজানা।

বনোয়ারী বলিল—বড় একটা আগুন কর আর সবাই কাছাকাছি ঘেঁষে থাকো। ছড়িয়ে থেকো না, নানা রকম বিপদ এ জঙ্গলে রাত্রিকালে।

গাছের নীচে ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, মাথার উপর অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা আকাশ, এখনও অন্ধকার নামে নাই, দূর নিকটে জঙ্গলের মাথায় বুনো তেউড়ির সাদা ফুল ফুটিয়া আছে রাশি রাশি, অজস্র। আমার ক্যাম্প-চেয়ারের পাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস আধ শুক্‌নো, সোনালী রঙের। রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধ, শুক্‌নো ঘাসের গন্ধ, কি একটা বন-ফুলের গন্ধ, যেন দুর্গা-প্রতিমার রাঙতার ডাকের সাজের গন্ধের মত। মনের মধ্যে এই উন্মুক্ত, বন্য জীবন আনিয়া দিয়াছে একটা মুক্তি ও আনন্দের অনুভূতি—যাহা কোথাও কখনও আসে না, এই রকম বিরাট নির্জন প্রান্তর ও জনহীন অঞ্চল ছাড়া। অভিজ্ঞতা না থাকিলে বলিয়া বোঝানো বড়ই কঠিন সে-মুক্ত-জীবনের উল্লাস।

**পাটোয়ারী** = খাজনা আদায়কারী।

এমন সময় আমাদের এক কুলি আসিয়া পাটোয়ারীর কাছে বলিল, একটু দূরে জঙ্গলের শুষ্ক ডালপালা কুড়াইতে গিয়া সে একটা কি জিনিস দেখিয়াছে। জায়গাটা ভাল নয়, ভূত বা পরীর আড্ডা, এখানে না তাঁবু ফেলিলেই হইত।

পাটোয়ারী বলিল—চলুন হুজুর, দেখে আসি কি জিনিসটা।

কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখাইয়া কুলিটা বলিল—ঐখানে নিকটে গিয়া দেখুন হুজুর। আর কাছে যাব না।

বনের মধ্যে কাঁটা-লতা ঝোপ হইতে মাথা উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই-করা, সন্ধ্যাবেলা দেখিলে ভয় পাইবার কথা বটে।

মানুষের হাতের তৈরি এ-বিষয়ে ভুল নাই, কিন্তু এ জনহীন জঙ্গলের মধ্যে এ স্তম্ভ কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না। জিনিসটা কত দিনের প্রাচীন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া বেলা ন'টার মধ্যে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া জঙ্গলের বর্তমান মালিকের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। সে আমায় জঙ্গল
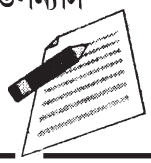
দেখাইয়া বেড়াইতেছে—হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা শুষ্ক নালার ওপারে ঘন বনের মধ্যে দেখি একটা প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষ জাগিয়া আছে—ঠিক কাল সন্ধ্যাবেলার সেই স্তম্ভটার মত। সেই রকমের বিকট মুখ খোদাই করা।

আমার সঙ্গে বনোয়ারী পাটোয়ারী ছিল, তাহাকেও দেখাইলাম। মালিকের কর্মচারী স্থানীয় লোক, সে বলিল—ও আরও তিন-চারটা আছে এ-অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। এ-দেশে আগে অসভ্য বুনো জাতির রাজা ছিল, ও তাদেরই হাতের তৈরি। ওগুলো সীমানার নিশানদিহি খাম্বা।

বলিলাম—খাম্বা কি ক'রে জানলে?

সে বলিল—চিরকাল শুনে আসছি বাবুজী, তা ছাড়া সেই রাজার বংশধর এখনও বর্তমান।

বড় কৌতূহল হইল।

—কোথায়?

লোকটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই জঙ্গলের উত্তর সীমানায় একটা ছোট বস্তি আছে—সেখানে থাকেন। এ-অঞ্চলে তাঁর বড় খাতির। আমরা শুনেছি উত্তরে হিমালয় পাহাড় আর দক্ষিণে ছোটোনাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের—এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল ওঁর পূর্বপুরুষ।

বুদ্ধু সিং বলিল—মুঘল বাদ্‌শাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে—এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা যখন বাংলাদেশে যেত—এরা উপদ্রব করত তীর-ধনুক নিয়ে। শেষে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন, তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বর্তমান রাজা। নাম দোবরু পান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরীব। কিন্তু এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

রাজসন্দর্শনে যাইতে হইলে কিছু নজর লইয়া যাওয়া উচিত। যার যা প্রাপ্য সম্মান, তাকে তা না দিলে কর্তব্যের হানি ঘটে।

কিছু ফলমূল, গোটা দুই বড় মুরগী—বেলা একটার মধ্যে নিকটবর্তী বস্তি হইতে কিনিয়া আনিলাম। এ-দিকের কাজ শেষ করিয়া বেলা দুইটার পরে বুদ্ধু সিংকে বলিলাম—চল, রাজার সঙ্গে দেখা করে আসি।

বুদ্ধু সিং তেমন উৎসাহ দেখাইল না। বলিল—আপনি সেখানে কি যাবেন! আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার উপযুক্ত নয়। পাহাড়ী অসভ্য জাতদের রাজা, তাই ব'লে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য বাবুজী? সে তেমন কিছু নয়।

তাহার কথা না শুনিয়াই আমি ও বনোয়ারীলাল রাজধানীর দিকে গেলাম। তাহাকেও সঙ্গে লইলাম।

রাজধানীটা খুব ছোট, কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস।

ছোটো ছোটো মাটির ঘর, খাপরার চাল—বেশ পরিষ্কার করিয়া লেপাপোঁছা দেওয়ালের গায়ে মাটির

**শব্দার্থ ও টীকা**

**প্রস্তরস্তম্ভ** = পাথর দিয়ে তৈরি থাম।

**নিশানদিহি** = নিশানা নির্দেশকারী।

**খাম্বা** = থাম।
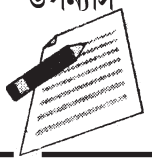
সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া। ছোটো ছোটো ছেলেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম করিতেছে। কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের সুঠাম গড়ন ও নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে কেমন সুন্দর একটা লাবণ্য প্রত্যেকেরই। সকলেই আমাদের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বুদ্ধু সিং একজন স্ত্রীলোককে বলিল—রাজা ছে রে?

স্ত্রীলোকটি বলিল, সে দেখে নাই। তবে কোথায় আর যাইবে, বাড়ীতেই আছে।

আমরা গ্রামে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বুদ্ধু সিং-এর ভাবে মনে হইল এইবার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নীত হইয়াছি। অন্য ঘরগুলির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের পার্থক্য এই মাত্র লক্ষ্য করিলাম যে, ইহার চারিপাশ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা—বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড়, সেখান হইতেই পাথর আনা হইয়াছে। রাজবাড়ীতে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি—কতকগুলি খুব ছোটো। তাদের গলায় পুঁতির মালা ও নীল ফলের বীজের মালা। দু-একটি ছেলে-মেয়ে দেখিতে বেশ সুশ্রী। ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে বুদ্ধু-সিং-এর ডাকে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াই আমাদের দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হইল কিছু ভয়ও পাইয়াছে।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজা কোথায়?

—মেয়েটি কে? বুদ্ধু সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজার নাতির মেয়ে।

রাজা বহুদিন জীবিত থাকিয়া নিশ্চয়ই বহু যুবক ও প্রৌঢ়কে রাজসিংহাসনে বসিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মেয়েটি বলিল—আমার সঙ্গে এস। জ্যাঠামশায় পাহাড়ের নীচে পাথরে বসে আছেন।

মানি বা নাই মানি, মনে মনে ভাবিলাম যে-মেয়েটি আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে, সে সত্যই রাজকন্যা—তাহার পূর্বপুরুষেরা এই অরণ্য-ভূভাগ বহুদিন ধরিয়া শাসন করিয়াছিল— সেই বংশের সে মেয়ে।

বলিলাম—মেয়েটির নাম কি জিজ্ঞেস কর।

বুদ্ধু সিং বলিল—ওর নাম ভানমতী।

বাঃ, বেশ সুন্দর—ভানুমতী! রাজকন্যা ভানুমতী!

ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্যমাখা মুখশ্রী—তবে পরনের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা। দূর হইতে একটা বড় বকাইন্ গাছ দেখাইয়া দিয়া ভানুমতী বলিল—তোমরা যাও, জ্যাঠামশায় ওই গাছতলায় ব'সে গরু চরাচ্ছেন।

গরু চরাইতেছেন কি রকম! প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম বোধ হয়। এই সমগ্র অঞ্চলের রাজা সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী গরু চরাইতেছেন!

**শব্দার্থ ও টীকা**

**ছে** = আছে।

**অনুচ্চ** = খুব উঁচু নয়।

**সুশ্রী** = সুন্দর।

শব্দার্থ ও টীকা

কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মেয়েটি চলিয়া গেল এবং আমরা আর কিছু অগ্রসর হইয়া বকাইন্ গাছের তলায় এক বৃদ্ধকে কাঁচা শালপাতায় তামাক জড়াইয়া ধূমপানরত দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—সেলাম, রাজাসাহেব।

রাজা দোবরু পান্না কানে শুনিতে পাইলেও চোখে খুব ভাল দেখিতে পান বলিয়া মনে হইল না।

বলিল—কে? বুদ্ধু সিং? সঙ্গে কে?

বুদ্ধু বলিল—একজন বাঙালী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উনি কিছু নজর এনেছেন—আপনাকে নিতে হবে।

নজর = ভেট, উপহার।

আমি নিজে গিয়া বৃদ্ধের সামনে মুরগী ও জিনিস কয়টি নামাইয়া রাখিলাম।

বলিলাম—আপনি দেশের রাজা, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বহুৎ দূর থেকে এসেছি।

বৃদ্ধের দীর্ঘায়ত চেহারার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল যৌবনে রাজা দোবরু পান্না খুব সুপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। মুখশ্রীতে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ খুব খুশী হইলেন। আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—কোথায় ঘর?

বলিলাম—কলকাতা।

—উঃ, অনেক দূর। বড় ভারী জায়গা শুনেছি কল্‌কাতা।

—আপনি কখনও যান নি?

—না, আমরা কি শহরে যেতে পারি? এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভাল। বোসো। ভান্‌মতী কোথায় গেল, ও ভান্‌মতী?

মেয়েটি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—কি জ্যাঠামশায়?

—এই বাঙালী বাবু ও তাঁর সঙ্গের লোকজন আজ আমার এখানে থাকবেন ও খাওয়া-দাওয়া করবেন।

আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—না, না, সে কি! আমরা এখুনি চলে যাব, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রেই—আমাদের থাকার বিষয়ে—

কিন্তু দোবরু পান্না বলিলেন—না, তা হতে পারে না। ভান্‌মতী, এই জিনিসগুলো নিয়ে যা এখান থেকে।

আমার ইঙ্গিতে বনোয়ারীলাল পাটোয়ারী নিজে জিনিসগুলি বহিয়া অদূরবর্তী রাজার বাড়ীতে লইয়া গেল, ভানুমতীর পিছু পিছু। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াই আমার সম্ভ্রমে মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা, প্রাচীন অভিজাত- বংশীয় বীর দোবরু পান্না (হইলই বা বন্য আদিম জাতি) আমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন— এ অনুরোধ আদেশেরই সামিল।

সম্ভ্রমে = শ্রদ্ধায়।

রাজা দোবরু পান্না অত্যন্ত দরিদ্র, দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে গরু চরাইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দোবরু পান্নার অপেক্ষা অনেক
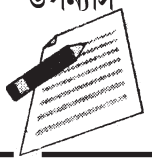
শব্দার্থ ও টীকা



বড় রাজা অবস্থাবৈগুণ্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা নিজের হাতে শালপাতার একটা চুরুট গড়িয়া আমার হাতে দিলেন। দেশলাই নাই— গাছের তলায় আগুন করাই আছে—তাহা হইতে একটা পাতা জ্বালাইয়া সম্মুখে ধরিলেন।

বলিলাম—আপনারা এ-দেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে।

দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে! আমাদের বংশ সূর্যবংশ। এই পাহাড়-জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়েস অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।

**বহিঃস্থিত** = বাইরে থাকা, বাইরের।

এই অরণ্য ভূভাগের বহিঃস্থিত অন্য কোনও পৃথিবীর খবর দোবরু পান্না রাখেন বলিয়া মনে হইল না। তাহার কথার উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

রাজা দোবরু বলিলেন—আমার ছোটো নাতি, জগরু পান্না। ওর বাবা এখানে নেই, লছমীপুরের রাণী-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ওরে জগরু, বাবুজীর জন্য খাওয়ার যোগাড় কর।

ভানুমতী আবার আসিয়া একটা পাথরের ভাঁড় আমাদের কাছে রাখিয়া গেল।

রাজা বলিলেন—তেল মাখুন। কাছেই চমৎকার ঝরণা—স্নান ক'রে আসুন সকলে।

আমরা স্নান করিয়া আসিলে রাজা আমাদের রাজবাড়ীর একটা ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

ভানুমতী একটা ধামায় চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল। জগরু সজারু ছাড়াইয়া মাংস আনিয়া রাখিল কাঁচা শালপাতার পাত্রে।

ভানুমতী আর একবার গিয়া দুধ ও মধু আনিল। আমার সঙ্গে ঠাকুর ছিল না, বনোয়ারী মেটে আলু ছাড়াইতে বসিল, আমি রাঁধিবার চেষ্টায় উনুন ধরাইতে গেলাম। কিন্তু শুধু বড় বড় কাঠের সাহায্যে উনুন ধরানো কষ্টকর। দু-একবার চেষ্টা করিয়া পারিলাম না, তখন ভানুমতী তাড়াতাড়ি একটা পাখীর শুক্‌নো বাসা আনিয়া উনুনের মধ্যে পুরিয়া দিতে আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিল। দিয়াই দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ, সরল মর্যাদাজ্ঞান।

রাজা দোবরু পান্না সব সময় রান্নাঘরের দুয়ারটির কাছে বসিয়া রহিলেন। আতিথ্যের এতটুকু ত্রুটি না ঘটে। আহারাদির পরে বলিলেন—আমার তেমন বেশি ঘরদোরও নেই, আপনাদের বড় কষ্ট হল। এই বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে আমার বংশের রাজাদের প্রকাণ্ড বাড়ীর চিহ্ন এখনও আছে। আমি বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি বহু প্রাচীনকালে ওখানে পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন। সে দিন কি আর এখন আছে! আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা এখনও সেখানে আছেন।

আমার বড় কৌতূহল হইল, বলিলাম—যদি আমরা একবার দেখতে যাই তাতে কি কোনও আপত্তি আছে, রাজাসাহেব?

—এর আবার আপত্তি কি! তবে দেখবার এখন বিশেষ কিছু নেই। আচ্ছা চলুন, আমি যাব। জগরু

শব্দার্থ ও টীকা

আমাদের সঙ্গে এস।

আমি আপত্তি করিলাম—বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধকে আর পাহাড়ে উঠাইবার কষ্ট দিতে মন সরিল না। সে আপত্তি টিকিল না, রাজাসাহেব হাসিয়া বলিলেন—এ পাহাড়ে আমায় ত প্রায়ই উঠতে হয়, ওর গায়েই আমার বংশের সমাধিস্থান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আমায় সেখানে যেতে হয়। চলুন সে-জায়গাও দেখাব।

উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে অনুচ্চ শৈলমালা (স্থানীয় নাম ধন্‌ঝরি) এক স্থানে আসিয়া যেন হঠাৎ ঘুরিয়া পূর্বমুখী হওয়ার দরুন একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে, এই খাঁজের নীচে একটা উপত্যকা, শৈলসানুর অরণ্য সারা উপত্যকা ব্যাপিয়া যেন সবুজের ঢেউয়ের মত নামিয়া আসিয়াছে, যেমন ঝরনা নামে পাহাড়ের গা বাহিয়া। অরণ্য এখানে ঘন নয়, ফাঁকা ফাঁকা—বনের গাছের মাথায় মাথায় সুদূর চক্রবালরেখায় নীল শৈলমালা, বোধ হয় গয়া কি রামগড়ের দিকের— যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই বনের শীর্ষ, কোথাও উঁচু, বড় বড় বনস্পতিসঙ্কুল, কোথাও নীচু, চারা শাল ও চারা পলাশ। জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম।

**শৈলসানু** = পাহাড়ের উপরকার সমতলভূমি।

**চক্রবালরেখা** = দিগন্তরেখা।

এক জায়গায় খুব বড় পাথরের চাঁই আড়ভাবে পোঁতা, ঠিক যেন একখানা পাথরের কড়ি যা ঢেঁকির আকারের। তার নীচে কুম্ভকারদের হাঁড়ি-কলসী পোড়ানো পণ-এর গর্তের মত কিংবা মাঠের মধ্যে খেঁকশেয়ালী যেমন গর্ত কাটে—ওই ধরনের প্রকাণ্ড একটা বড় গর্তের মুখ। গর্তের মুখে চারা শালের বন।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই গর্তের মধ্যে ঢুকতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে। কোনো ভয় নেই। জগরু আগে যাও।

প্রাণ হাতে করিয়া গর্তের মধ্যে ঢুকিলাম। বাঘ-ভাল্লুক তো থাকিতেই পারে, না থাকে সাপ তো আছেই।

গর্তের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া খানিকদূর গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়ানো যায়। ভয়ানক অন্ধকার ভিতরে প্রথমটা মনে হয়, কিন্তু চোখ অন্ধকারে কিছুক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তত অসুবিধা হয় না ; জায়গাটা প্রকাণ্ড একটা গুহা, কুড়ি-বাইশ হাত লম্বা, হাত পনের চওড়া—উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে আবার একটা খেঁকশিয়ালীর মত গর্ত দিয়া খানিক দূর গেলে দেওয়ালের ওপারে ঠিক এই রকম নাকি আর একটা গুহা আছে।

ইহাই নাকি দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের দুর্গ-প্রাসাদ।

আসলে ইহা একটা বড় প্রাকৃতিক গুহা—প্রাচীনকালে পাহাড়ের উপর দিকে মুখওয়ালা এ গুহায় আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে সহজে আত্মরক্ষা করা যাইত।

রাজা বলিলেন—এর আর একটা গুপ্ত মুখ আছে—সে কাউকে বলা নিয়ম নয়। সে কেবল আমার বংশের লোক ছাড়া কেউ জানে না। যদিও এখন এখানে কেউ বাস করে না, তবুও এই নিয়ম চলে আসছে বংশে।

গুহাটা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল।

**ধড়ে** = শরীরে।

তারপর আরও খানিকটা উঠিয়া এক জায়গায় প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া বড় বড়-সরু মোটা ঝুরি নামাইয়া, পাহাড়ের মাথার অনেকখানি ব্যাপিয়া এক বিশাল বটগাছ।

রাজা দোবরু পান্না বলিলেন—জুতো খুলে চলুন মেহেরবানি করে।

**মেহেরবানি** = অনুগ্রহ।

**শব্দার্থ ও টীকা**

বটগাছতলায় যেন চারিধারে বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের আকারে পাথর ছড়ানো।

রাজা বলিলেন—ইহাই তাঁহার বংশের সমাধিস্থান। এক-একখানা পাথরের তলায় এক-একটা রাজবংশীয় লোকের সমাধি। বিশাল বটতলার সমস্ত স্থান জুড়িয়া সেই রকম বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো—কোনো কোনো সমাধি খুবই প্রাচীন, দু'দিক হইতে ঝুরি নামিয়া যেন সেগুলিকে সাঁড়াশির মত আটকাইয়া ধরিয়াছে, সে সব ঝুরি আবার গাছের গুঁড়ির মতো—মোটা হইয়া গিয়াছে—কোনো কোনো শিলাখণ্ড ঝুরির তলায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সেগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

**অনুমান**—ধারণা, কল্পনা।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই বটগাছ আগে এখানে ছিল না। অন্য অন্য গাছের বন ছিল। একটি ছোটো বটচারা ক্রমে বেড়ে অন্য অন্য গাছ মেরে ফেলে দিয়েছে। এই বটগাছটাই এত প্রাচীন যে, এর আসল গুঁড়ি নেই। ঝুরি নেমে যে গুঁড়ি হয়েছে, তারাই এখন রয়েছে। গুঁড়ি কেটে উপড়ে ফেললে দেখবেন ওর তলায় কত পাথর চাপা পড়ে আছে। এইবার বুঝুন কত প্রাচীন সমাধিস্থান এটা।

স্থানটির গাম্ভীর্য, রহস্য ও প্রাচীনত্ত্বের ভাব অবর্ণনীয়। তখন বেলা প্রায় হেলিয়া পড়িয়াছে, হলদে রোদ পত্ররাশির গায়ে, ডাল ও ঝুরির অরণ্যে ধনঝরির অন্য চূড়ায়, দূর বনের মাথায়। অপরাহ্নের সেই ঘনায়মান ছায়া এই সুপ্রাচীন রাজ-সমাধিকে যেন আরও গম্ভীর, রহস্যময় সৌন্দর্য দান করিল।

**গাম্ভীর্য** = গম্ভীরতা।

মিশরের প্রাচীন সম্রাটদের সমাধিস্থল থিব্‌স সাগরের অদূরবর্তী 'ভ্যালি অব্ দি কিংস' আজ পৃথিবীর টুরিস্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাক পিটানোর অনুগ্রহে সেখানকার বড় বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজগিজ করে—'ভ্যালি অব্ দি কিংস' অতীত কালের কুয়াশায় যত না অন্ধকার হইয়াছিল, তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামী সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায়—কিন্তু তার চেয়ে কোনো অংশে রহস্যে ও স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমায় কম নয় সুদূর অতীতের এই অনার্য নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন অরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়া আছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশ্বর্য নাই মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মত—কারণ এরা ছিল দরিদ্র, এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মানুষের আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিতান্ত শিশু-মানবের মন লইয়া ইহারা রচনা করিয়াছে ইহাদের গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি, সীমানাজ্ঞাপক খুঁটি। সেই অপরাহ্নের ছায়ায় পাহাড়ের উপরে সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্বব্যাপী শাশ্বত কালের পিছন দিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম—পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্যায়ে পড়িয়া যায়।

**ভ্যালি অব্ দি কিংস** = মিশরের রাজাদের মৃত্যুর পর যেখানে কবর দেওয়া হত। সে-স্থানের নাম ভ্যালি অব্ দি কিংস। স্থানটি থিবস্ সাগরের নিকটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা এই সমাধিস্থল দেখতে আসেন।

**পাবলিসিটি** = প্রচার।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজসমাধি ও বটতরুতল আবৃত হইবার পূর্বেই আমরা সেদিন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

নামিবার পথে একস্থানে জঙ্গলের মধ্যে একখানা খাড়া সিঁদুরমাখা পাথর। আশেপাশে মানুষের হস্তরোপিত গাঁদাফুলের ও সন্ধ্যামণি-ফুলের গাছ। সামনে আর একখানা বড় পাথর, তাতেও সিঁদুর মাখা। বহুকাল হইতে নাকি এই দেবস্থান এখানে প্রতিষ্ঠিত, রাজবংশের ইনি কুলদেবতা। পূর্বে এখানে নরবলি হইত—সম্মুখের বড় পাথরখানিই যূপ-রূপে ব্যবহৃত হইত। এখন পায়রা ও মুরগী বলি প্রদত্ত হয়।

**হস্তরোপিত** = হাতে পোঁতা হয়েছে এমন।

**যূপ-রূপে** = হাড়িকাঠ রূপে।
**প্রদত্ত** = দেওয়া।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ঠাকুর ইনি?
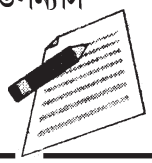
শব্দার্থ ও টীকা

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো, বুনো মহিষের দেবতা।

মনে পড়িল গত শীতকালে গনু মাহাতোর মুখে শোনা সেই গল্প।

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে।

এই অরণ্যচারী আদিম সমাজের দেবতাকে সভ্য জগতে কেউই মানে না, জানেও না—কিন্তু ইহা যে কল্পনা নয়, এবং এই দেবতা যে সত্যই আছেন—তাহা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল সেই বিজন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য ও পর্বত অঞ্চলের নিবিড় সৌন্দর্য ও রহস্যের মধ্যে বসিয়া।

**বিজন** = জনহীন, নির্জন।
**নিবিড়** = গহন, ঘন, গভীর।

আমি নওয়াদা হইতে মোটর বাস ধরিয়া গয়ায় আসিব বলিয়া সন্ধ্যার পরেই রওনা হইলাম। বনোয়ারী আমাদের ঘোড়া লইয়া তাঁবুতে ফিরিল। আসিবার সময় আর একবার রাজকুমারী ভানুমতীর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে এক বাটি মহিষের দুধ লইয়া আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া ছিল রাজবাড়ীর দ্বারে।

## অনুবিভাগ - 32.3.14

সেদিন গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের নীচে জমি মাপিয়া দিতে গিয়াছি, আস্‌রফি টিণ্ডেল জমি মাপিতেছিল, আমি ঘোড়ার উপর বসিয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় কুন্তাকে টোলার পথ ধরিয়া যাইতে দেখিলাম।

কুন্তাকে অনেক দিন দেখি নাই। আস্‌রফিকে বলিলাম—কুন্তা আজকাল কোথায় থাকে, ওকে দেখিনে তো?

—ঝল্লুটোলায় এক গাঙেগোতার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের গোয়ালঘরের পাশে একখানা ছোট্ট চালা আছে সেখানেই থাকে।

—চলে কি করে? ওর তো দু-তিনটে ছেলেমেয়ে?

—ভিক্ষে করে—ক্ষেতের ফসল কুড়োয়। কলাই গম কাটে। বড় ভাল মেয়ে বাবু কুন্তা। বাইজীর মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু ভাল ঘরের মেয়ের মত মন-মেজাজ—কোন অসৎ কাজ ওকে দিয়ে হবে না।

জরীপ শেষ হইল। বালিয়া জেলার একটি প্রজা এই জমি বন্দোবস্ত লইয়াছে—কাল হইতে এখানে সে বাড়ী বাঁধিবে। গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের মহিমাও ধ্বংস হইল।

মহালিখারূপের পাহাড়ে উপরকার বড় বড় গাছপালার মাথায় রোদ রাঙা হইয়া আসিল। সিল্লীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে উড়িয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার আর দেরি নাই।

একটা কথা ভাবিলাম।

এতটুকু জমি কোথাও থাকিবে না এই বিশাল লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারে, যেমন দেখিতেছি। দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া জমি লইয়া ফেলিল—কিন্তু এই অরণ্যভূমিতে যাহারা চিরকাল মানুষ, অথচ যাহারা
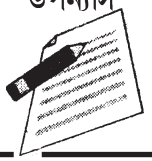
শব্দার্থ ও টীকা



নিঃস্ব, হতভাগ্য—জমি বন্দোবস্ত লইবার পয়সা নাই বলিয়াই কি তাহারা বঞ্চিত থাকিবে? যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের অন্তত এতটুকু উপকার করিবই।

আস্‌রফিকে বলিলাম—আস্‌রফি, কুন্তাকে কাল সকালে কাছারিতে হাজির করতে পারবে? ওকে একটু দরকার আছে।

—হাঁ হুজুর, যখন বলবেন।

পরদিন সকালে কুন্তাকে আস্‌রফি আমার আপিস-ঘরের সামনে বেলা ন'টার সময় লইয়া আসিল।

বলিলাম—কুন্তা, কেমন আছ?

কুন্তা আমায় দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—জী হুজুর, ভাল আছি।

—তোমার ছেলেমেয়েরা?

**দোয়ায়** = দয়ায়।

—ভাল আছে হুজুরের দোয়ায়।

—বড় ছেলেটি কত বড় হল?

—এই আট বছরে পড়েছে, হুজুর।

বলিলাম—কুন্তা, জমি নেবে?

কুন্তা কথাটি ঠিক শুনিয়াছে কিনা বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত মুখে বলিল—জমি, হুজুর?

—হাঁ, জমি। নূতন-বিলি জমি।

কুন্তা একটুখানি কি ভাবিল। পরে বলিল—আগে তো আমাদেরই কত জোতজমা ছিল। প্রথম প্রথম এসে দেখেছি। তার পর সব গেল একে একে। এখন আর কি দিয়ে জমি নেব, হুজুর?

—কেন, সেলামীর টাকা দিতে পারবে না?

**দিনমানে** = দিনেরবেলা।

—কোথা থেকে দেব? রাত্তির ক'রে ক্ষেত থেকে ফসল কুড়োই, পাছে দিনমানে কেউ অপমান করে। আধ টুক্‌রি এক টুক্‌রি কলাই পাই—তাই গুঁড়ো করে ছাতু ক'রে বাচ্ছাদের খাওয়াই।

কুন্তা কথা বন্ধ করিয়া চোখ নীচু করিল। দুই চোখ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আস্‌রফি সরিয়া গেল। ছোকরার হৃদয় কোমল, এখনও পরের দুঃখ ভাল রকম সহ্য করিতে পারে না।

আমি বললাম—কুন্তা, আচ্ছা ধর যদি সেলামী না লাগে?

কুন্তা চোখ তুলিয়া জলভরা বিস্মিত চোখে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আস্‌রফি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কুন্তার সামনে হাত নাড়িয়া বলিল—হুজুর তোমায় এমনি জমি দেবেন, এমনি জমি দেবেন—বুঝলে না দাইজী?

আস্‌রফিকে বলিলাম—ওকে জমি দিলে ও চাষ করবে কি ক'রে আসরফি?
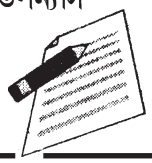
আস্‌রফি বলিল—সে বেশি কঠিন কথা নয় হুজুর। ওকে দু-একখানা লাঙ্গল দয়া ক'রে সবাই ভিক্ষে দেবে। এত ঘর গাঙ্গোতা প্রজা, একখানা লাঙল ঘরপিছু দিলেই ওর জমি চাষ হয়ে যাবে। আমি সে ভার নেব, হুজুর।

—আচ্ছা, কত বিঘে হ'লে ওর হয়, আস্‌রফি?

—দিচ্ছেন যখন মেহেরবানি ক'রে হুজুর, দশ বিঘে দিন।

কুন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা, কেমন, দশ বিঘে জমি যদি তোমায় বিনা সেলামীতে দেওয়া যায়—তুমি ঠিকমত চাষ ক'রে ফসল তুলে কাছারির খাজনা শোধ করতে পারবে তো? অবিশ্যি প্রথম দু-বছর তোমার খাজনা মাপ। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে।

কুন্তা যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে।

কতকটা দিশাহারা ভাবে বলিল—জমি! দশ বিঘে জমি!

আস্‌রফি আমার হইয়া বলিল—হাঁ, হুজুর তোমায় দিচ্ছেন! খাজনা দু-বছর মাপ। তীস্‌রা সাল থেকে খাজনা দিও। কেমন, রাজী?

কুন্তা লজ্জাজড়িত মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—জী হুজুর মেহেরবান। পরে হঠাৎ বিহ্বলার মত কাঁদিয়া ফেলিল।

আমার ইঙ্গিতে আস্‌রফি তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

**শব্দার্থ ও টীকা**

**ভার** = দায়িত্ব।

**হতবুদ্ধি** = বুদ্ধি নাশ হওয়া।

**তীস্‌রা** = তৃতীয়।

**লজ্জাজড়িত** = লজ্জা মেশানো।

**ইঙ্গিত** = ইশারা।

## অনুবিভাগ - 32.3.15

এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। একবার ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। ধন্‌ঝরি শৈলমালা একটি সুন্দর স্বপ্নের মত আমার মন অধিকার করিয়া আছে.... তাহার বনানী....তাহার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি....

সঙ্গে লইলাম যুগলপ্রসাদকে।

তহশীলদার সজ্জন সিং-এর ঘোড়াটাতে যুগলপ্রসাদ চড়িয়াছিল—আমাদের মহালের সীমানা পার হইতে না-হতেই বলিল—হুজুর, এ ঘোড়া চলবে না, জঙ্গলের পথে রহল চাল ধরলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও পা খোঁড়া হবে। বদলে নিয়ে আসি।

**তহশীলদার** = যে খাজনা আদায় করে।

তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। সজ্জন সিং ভাল সওয়ার, সে কতবার পূর্ণিয়ায় মোকদ্দমা তদারক করিতে গিয়েছে এই ঘোড়ায়। পূর্ণিয়া যাইতে হইলে কেমন পথে যাইতে হয় যুগলপ্রসাদের তাহা অজ্ঞাত নয় নিশ্চয়ই।

শীঘ্রই কারো নদী পার হইলাম।

তারপর অরণ্য, অরণ্য—সুন্দর, অপূর্ব, ঘন নির্জন অরণ্য! পূর্বেই বলিয়াছি এ-জঙ্গলে মাথার উপরে গাছপালার ডালে ডালে জড়াজড়ি নাই—কেঁদ-চারা, শাল-চারা, পলাশ, মহুয়া, কুলের অরণ্য—প্রস্তরাকীর্ণ রাঙা

শব্দার্থ ও টীকা



মাটির ডাঙা, উঁচু-নীচু। মাঝে মাঝে মাটির উপর বন্যহস্তীর পদচিহ্ন। মানুষজন নাই।

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম লবটুলিয়ার নূতন তৈরী ঘিঞ্জি কুশ্রী টোলা ও বস্তি এবং একঘেয়ে ধূসর, চষা জমি দেখিবার পরে। এ-রকম আরণ্যপ্রদেশ এদিকে আর কোথাও নাই।

এই পথের সেই দুটি বন্য গ্রাম—বুরুডি ও কুলপাল বেলা বারোটার মধ্যে ছাড়াইলাম। তার পরেই ফাঁকা জঙ্গল পিছনে পড়িয়া রহিল—সম্মুখে বড় বড় বনস্পতির ঘন অরণ্য। কার্তিকের শেষ, বাতাস ঠাণ্ডা—গরমের লেশমাত্রও নাই।

দূরে দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিল।

সন্ধ্যার পর কাছারিতে পৌঁছিলাম।

**অপ্রত্যাশিত** = প্রত্যাশার বাইরে।
**আগমনে** = আসায়, উপস্থিতিতে।

পরদিন ভোরে রওনা হইয়া বেলা ন-টার মধ্যে দোবরু পান্নার রাজধানী চক্‌মকিটোলায় পৌঁছানো গেল। ভানুমতী কী খুশি আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে! তার মুখে-চোখে খুশি যেন চাপিতে পারিতেছে না, উপচাইয়া পড়িতেছে।

—আপনার কথা কালও ভেবেছি বাবুজী। এতদিন আসনে নি কেন?

ভানুমতীকে একটু লম্বা দেখাইতেছে, একটু রোগাও বটে। তাছাড়া মুখশ্রী আছে ঠিক তেমনি লাবণ্যভরা, সেই নিটোল গড়ন তেমনি আছে।

—নাইবেন তো ঝরনায়? মহুয়া তেল আনব, না কড়ুয়া তেল? এবার বর্ষায় ঝরনায় কি সুন্দর জল হয়েছে দেখবেন চলুন।

আর একটা জিনিস লক্ষ করিয়া আসিতেছি—ভানুমতী ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে তার সেদিক দিয়া তুলনাই হয় না—তার বেশভূষা ও প্রসাধনের সহজ সৌন্দর্য ও রুচিবোধই তাকে অভিজাতবংশের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে-মাটির ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছি, তাহার উঠানের চারিধারে বড় বড় আসান ও অর্জুন গাছ। এক ঝাঁক সবুজ বনটিয়া সামনের আসান গাছটার ডালে কলরব করিতেছে। হেমন্তের প্রথম, বেলা চড়িলেও বাতাস ঠাণ্ডা। আমার সামনে আধ মাইলেরও কম দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে চেরা সিঁথির মত পথ—একদিকে অনেক দূরে নীল মেঘের মত দৃশ্যমান গয়া জেলার পাহাড়শ্রেণী।

**পল্লবপ্রচ্ছায়** = নতুন পাতায় আচ্ছাদিত বা বিস্তারিত।
**স্বতন্ত্র** = পৃথক আলাদা।

বিড়ির পাতার জঙ্গল ইজারা লইয়া এই শান্ত জনবিরল বন্য প্রদেশের পল্লবপ্রচ্ছায় উপত্যকার কোনো পাহাড়ী ঝরনার তীরে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতাম চিরদিন। লবটুলিয়া তো গেল, ভানুমতীর দেশের এ-বন কেহ নষ্ট করিবে না। এ-অঞ্চলে মরুমকাঁকর ও পাইওরাইট্ বেশি মাটিতে, ফসল তেমন হয় না—হইলে এ-বন কোন্ কালে ঘুচিয়া যাইত। তবে যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে, সে স্বতন্ত্র কথা।

ভানুমতী তেল আনিয়া সামনে দাঁড়াইল। বাড়ীর সবাই আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতীর ছোট কাকা নবীন যুবক জগরু একটা গাছের ডাল ছুলিতে ছুলিতে আসিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। এই ছেলেটিকে আমি বড় পছন্দ করি। রাজপুতের মত চেহারা ওর, কালোর উপরে কি রূপ। এদের
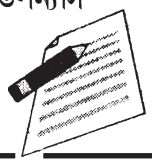
শব্দার্থ ও টীকা

বাড়ীর মধ্যে এই যুবক এবং ভানুমতী, এদের দুজনকে দেখলেই সত্যই যে ইহারা বন্য জাতির মধ্যে অভিজাতবংশ, তা মনে না হইয়া পারে না।

বলিলাম—কি জগরু শিকার-টিকার কেমন চলছে?

জগরু হাসিয়া বলিল—আপনাকে আজই খাইয়ে দেব বাবুজী, ভাববেন না। বলুন কি খাবেন, সজারু, না হরিয়াল, না বনমোরগ?

স্নান করিয়া আসিলাম। ভানুমতী নিজের সেই আয়নাখানি (সেবার যেখানা পূর্ণিয়া হইতে আনাইয়া দিয়াছিলাম) আর একখানা কাঠের কাঁকুই চুল আঁচড়াইবার জন্য আনিয়া দিল।

আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, ভানুমতী প্রস্তাব করিল—বাবুজী চলনু, পাহাড়ে উঠবেন না? আপনি তো ভালবাসেন।

যুগলপ্রসাদ ঘুমাইতেছিল, সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিলে আমরা বেড়াইবার জন্য বাহির হইলাম। সঙ্গে রহিল ভানুমতী, ওর খুড়তুতো বোন—জগরু পান্নার মেজ ভাইয়ের মেয়ে, বছর বারো বয়স—আর যুগলপ্রসাদ।

**কাঁকুই** = চিরুনি।

আধ মাইল হাঁটিয়া পাহাড়ের নীচে পৌঁছিলাম।

ধন্‌ঝরির পাদমূলে এই জায়গায় বনের দৃশ্য এত অপূর্ব যে, খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকেই বড় বড় গাছ, লতা, উপল-বিছানো ঝরনার খাদ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোটো-বড় শিলাস্তূপ। ধন্‌ঝরির দিকে বন ও পাহাড়ের আড়ালে আকাশটা কেমন সরু হইয়া গিয়াছে, সামনে লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা উঁচু হইয়া ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের ও-পারের দিকে উঠিয়াছে, কেমন খট্‌খটে শুক্‌নো ডাঙার মাটি, কোথাও ভিজা নয়, স্যাঁৎসেতে নয়। ঝরনার খাদেও এতটুকু জল নাই।

**উপল** = শিলা, প্রস্তর।
**ইতস্তত** = এদিক-ওদিক, এখানে-সেখানে।
**সুবাসে** = সুগন্ধে।

হেমন্তের অপরাহ্নের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তপর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, মূর্তিমতী বনদেবীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—কৃষ্ণা বনদেবী! রাজকুমারী তো ও বটেই! এই বনাঞ্চল, এই পাহাড়, ওই মিছি নদী, কারো নদীর উপত্যকা, এদিকে ধন্‌ঝরি, ওদিকে নওয়াদার শৈলশ্রেণী—এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই রাজবংশের মেয়ে—আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্যস্ত দরিদ্র, প্রভাবহীন—তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মত। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।

**সপ্তপর্ণ** = ছাতিম গাছ।

আজকার এই অপরাহ্নটি আমার জীবনে আরও বহু সুন্দর অপরাহ্নের সঙ্গে মিলিয়া মধুময় স্মৃতির সমারোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—স্বপ্নের মত মধুর, স্বপ্নের মতই অবাস্তব।

**পরাক্রান্ত** = বলশালী।

ভানুমতী বলিল—চলুন, আরও উঠবেন না?

**ট্র্যাজিক** = দুঃখময়।

—কি সুন্দর ফুলের গন্ধ বল তো? একটু বসবে না এখানে? সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখি—

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আপনার যা মর্জি বাবুজী। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের কবরে ফুল দেবেন না? আপনি সেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি রোজ পাহাড়ে উঠি ফুল দিতে। এখন তো বনে কত ফুল।
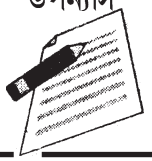
**শব্দার্থ ও টীকা**

**মর্জি** = ইচ্ছে, খুশি।

ভানুমতী একগুচ্ছ ছাতিম ফুল পাড়িয়া খোঁপায় গুঁজিল। বলিল—বসব, না উঠবেন বাবুজী?

আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যেকের হাতে এক-একটা ছাতিম ফুলের ডাল। একেবারে পাহাড়ের উপর উঠিয়া গেলাম। সেই প্রাচীন বটগাছটা ও তার তলায় প্রাচীন রাজসমাধি। বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের মত পাথর চারিদিকে ছড়ানো। রাজা দোবরু পান্নার কবরের উপর ভানুমতী ও তাহার বোন নিছনী ফুল ছড়াইল, আমি ও যুগলপ্রসাদ ফুল ছড়াইলাম।

ভানুমতী বালিকা তো বটেই, সরলা বালিকার মতই মহা খুশি। বালিকার মত আব্দারের সুরে বলিল—এখানে একটু দাঁড়াই বাবুজী, কেমন? বেশ লাগছে, না?

আমি ভাবিতেছিলাম—এই শেষ। আর এখানে আসিব না। এ পাহাড়ের উপরকার সমাধিস্থান, এ বনাঞ্চল আর দেখিব না। ধন্‌ঝরির শৈলচূড়ায় পুষ্পিত সপ্তপর্ণের নিকট, ভানুমতীর নিকট, এই আমার চিরবিদায়। ছ-বছরের দীর্ঘ বনবাস সাঙ্গ করিয়া কলিকাতা নগরীতে ফিরিব—কিন্তু যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কেন এত বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছি।

**আব্দার** = বায়না।

ছাতিম বন এখানে নাই—সে আরও নীচে নামিলে তবে। এরই মধ্যে গাছপালার ডালে জোনাকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস কি সতেজ, মধুর, প্রাণারাম! এ বাতাস সকালে বিকালে উপভোগ করিলে আয়ু না বাড়িয়া পারে? নামিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, কিন্তু বন্য জন্তুর ভয় আছে—তা ছাড়া ভানুমতী সঙ্গে রহিয়াছে। যুগলপ্রসাদ বোধহয় ভাবিতেছিল, নূতন কোন্ ধরনের গাছপালা এ জঙ্গল হইতে লইয়া গিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে পারে। দেখিলাম তাহার সমস্ত মনোযোগ নূতন লতাপাতার ফুল, সুদৃশ্য পাতার গাছ প্রভৃতির দিকে নিবদ্ধ—অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। যুগলপ্রসাদ পাগলই বটে, কিন্তু ঐ এক ধরনের পাগল।

ভানুমতী বলিল—বাঁয়ে ওই টাঁড়বারের গাছ—চিনেছেন?

বন্য-মহিষের রক্ষাকর্তা সদয় দেবতা টাঁড়বারোর গাছ অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই। আকাশে চাঁদ নাই, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

অনেকটা নামিয়া আসিয়াছি। এবার সেই ছাতিম বন। কি মিষ্ট মনমাতানো গন্ধ!

ভানুমতীকে বলিলাম—এখানে একটু বসি।

পরে সেই বনপথে অন্ধকারের মধ্যে নামিতে নামিতে ভাবিলাম, লবটুলিয়া গিয়াছে, নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহার গিয়াছে—কিন্তু মহালিখারূপের পাহাড় রহিল—ভানুমতীর ঝন্‌ঝরি পাহাড়ের বনভূমি রহিল। এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষে অরণ্য দেখিতে পাইবে না—শুধুই চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।

## অনুবিভাগ - 32.3.16

রাত্রে বসিয়া জগরু পান্না, তাহার দাদার মুখে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা শুনিলাম। মহাজনের

শব্দার্থ ও টীকা

দেনা এখনও শোধ হয় নাই, দুইটি মহিষ ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছে, না কিনিলে চলে না, গয়ার এক মাড়োয়ারী মহাজন আগে আসিয়া ঘি কিনিয়া লইয়া যাইত—আজ তিন-চার মাস সে আর আসে না। প্রায় আধ মণ ঘি ঘরে মজুত, খরিদ্দার নাই।

ভানুমতী আসিয়া দাওয়ার একধারে বসিল। যুগলপ্রসাদ অত্যন্ত চা-খোর, সে চা-চিনি সঙ্গে আনিয়াছে আমি জানি। কিন্তু লাজুকতাবশত গরম জলের কথা বলিতে পারিতেছে না, তাহাও জানি। বলিলাম—চায়ের জল একটু গরম করার সুবিধে হবে কি ভানুমতী?

রাজকুমারী ভানুমতী চা কখনও করে নাই। চা খাইবার রেওয়াজই নাই এখানে। তাহাকে জলের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতে সে মাটির হাঁড়িতে জল গরম করিয়া আনিল। তাহার ছোটো বোন কয়েকটি পাথরবাটি আনিল। ভানুমতীকে চা খাইবার অনুরোধ করিলাম, সে খাইতে চাহিল না। জগরু পান্না পাথরের ছোট খোরার এক খোরা চা শেষ করিয়া আরও খানিকটা চাহিয়া লইল।

চা খাইয়া আর-সকলে উঠিয়া গেল, ভানুমতী গেল না। আমায় বলিল—ক'দিন এখানে আছেন বাবুজী? এবার বড় দেরি ক'রে এসেছেন। কাল তো যেতেই দেব না। চলুন আপনাকে কাল ঝাটি ঝরনা বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ঝাটি ঝরনায় আরও ভয়ানক জঙ্গল। ওদিকে বড্ড বুনো হাতি। অনেক বনময়ূরও আছে দেখতে পাবেন। চমৎকার জায়গা। পৃথিবীর মধ্যে এমন আর নেই।

রেওয়াজ = প্রথা, অভ্যেস।

ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ভানুমতী, কখনো কোনো শহর দেখেছ?

—না বাবুজী।

—দু-একটা শহরের নাম বল তো?

—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

—কলকাতার নাম শোননি?

—হাঁ বাবুজী।

—কোন্ দিকে জান?

—কি জানি বাবুজী!

—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

—ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চক্‌মকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে?

পরে হাতখানি একবার তুলিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া গর্বের সহিত বলিল—জানেন বাবুজী, এই সমস্ত দেশ
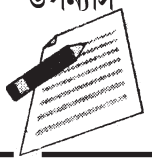
আমাদের রাজ্য ছিল। সারা পৃথিবীটা। বনে যে গোঁড় দেখেন, সাঁওতাল দেখেন, ওরা আমাদের জাত নয়। আমরা রাজগোঁড়। আমাদের প্রজা ওরা, আমাদের রাজা ব'লে মানে।

উহার কথায় দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। মহাজন দেনার দায়ে দুই বেলা যাহাদের মহিষ ধরিয়া লইয়া যায়, সেও রাজবংশের গর্ব করিতে ছাড়ে না।

বলিলাম—আমি জানি ভানুমতী তোমাদের কত বড় বংশ—

ভানুমতী বলিল—তারপর শুনুন বাবুজী, আমাদের সেই মহিষটা বাঘে নিয়ে গেল। জ্যাঠামশায় যে মহিষটা এনেছিলেন।

—কি ক'রে?

—জ্যাঠামশায় ওই পাহাড়ের নীচে চরাতে নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলায় বসেছিলেন, সেখানে বাঘে ধরল।

বলিলাম—তুমি বাঘ দেখেছ কখনও?

ভানুমতী কালো জোড়া-ভুরু দুটি আশ্চর্য হইবার ভঙ্গিতে উপরের দিকে তুলিয়া বলিল—বাঘ দেখিনি বাবুজী! শীতকালে আসবেন চক্‌মকিটোলায়—বাড়ীর উঠোন থেকে গরু-বাছুর ধরে নিয়ে চলে যায়—

বলিয়াই সে ডাকিল—নিছনি, নিছনি—শোন্—

ছোট বোন আসিলে বলিল—নিছনি, বাবুজীকে শুনিয়ে দে তো আর বছর শীতকালে বাঘ রোজ রাতে আমাদের উঠোনে এসে কি ক'রে বেড়াত। জগরু একদিন ফাঁদ পেতেছিল। ধরা পড়ল না।

পরে হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, বাবুজী, একখানা চিঠি পড়ে দেবেন? কোথা থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, কে পড়বে, এমনি তোলা রয়েছে। যা নিছনি, চিঠিখানা নিয়ে আয়, আর জগরু-কাকাকেও ডেকে নিয়ে আয়—

নিছনি চিঠি পাইল না। তখন ভানুমতী নিজে গিয়া অনেক খুঁজিয়া সেখানা বাহির করিয়া আমার হাতে আনিয়া দিল।

বলিলাম—কবে এসেছে এখানা?

ভানুমতী বলিলি—মাস ছ-সাত হবে বাবুজী—তুলে রেখে দিইছি, আপনি এলে পড়াবো। আমরা তো কেউ পড়তে পারিনে। ও নিছনি, জগরু-কাকাকে ডেকে নিয়ে আয়। চিঠি পড়া হবে—সবাইকে ডাক দে।

ছ-সাত মাস পূর্বের পুরনো অপঠিত পত্রখানা আমি যুগলপ্রসাদের উনুনের আলোয় পড়িতে বসিলাম—আমার চারধারে বাড়ীসুদ্ধ লোক ঘিরিয়া বসিল চিঠি শুনিবার জন্য। চিঠিখানা কায়েথী-হিন্দিতে লেখা—রাজা দোবরু পান্নার নামে চিঠি। পাটনার জনৈক মহাজন রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে, এখানে বিড়িপাতার জঙ্গল আছে কিনা—থাকিলে কি দরে ইজারা বিলি হয়।

এ পত্রের সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্পর্ক নাই—ইহাদের অধীনে কোনো বিড়ি-পাতার জঙ্গল নাই। রাজা

## শব্দার্থ ও টীকা

**গোঁড়** = একটি জন জাতির নাম।

**ফাঁদ** = পশু ধরার কৌশল।

শব্দার্থ ও টীকা

দোবরু নামে রাজা ছিলেন, চক্‌মকিটোলার নিজ বসতবাটীর বাহিরে তাঁর যে কোথাও এক ছটাক জমিও নাই একথা পাটনার উক্ত পত্রলেখক মহাজন জানিলে ডাকমাশুল খরচ করিয়া বৃথা পত্র দিত না নিশ্চয়ই।

একটু দূরে দাওয়ার ও-পাশে যুগলপ্রসাদ রান্না করিতেছে। তাহার কাঠের উনুনের আলোয় দাওয়ার খানিকটা আলো হইয়াছে। এদিকে দাওয়ার অর্ধেকটায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, যদিও কৃষ্ণপক্ষের আজ মোটে তৃতীয়া—ধন্‌ঝরি পাহাড়ের আড়াল কাটাইয়া এই কিছুক্ষণ মাত্র চাঁদ ফাঁকা আকাশে দৃশ্যমান হইয়াছে। সামনে কিছুদূরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়শ্রেণী—চক্‌মকিটোলার বস্তির ছেলেপুলেদের কথা ও কলরব শোনা যাইতেছে।....কি সুন্দর ও অপূর্ব মনে হইতেছিল এই বন্য গ্রামে যাপিত এই রাত্রিটি। ভানুমতীর তুচ্ছ ও সাধারণ গল্পও কি আনন্দই দিতেছিল! সেদিন বলভদ্রের মুখে শোনা সেই উন্নতি করিবার কথা মনে পড়িল।

মানুষে কি চায়—উন্নতি, না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন শান-বাঁধানো—রস ঢুকিতে পায় না।

যুগলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, রান্না হইয়াছে, চৌকা লাগাইবে কিনা। ভানুমতীদের বাড়ীতে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। এদেশে আনাজ মেলে না, তবুও কোথা হইতে জগরু বেগুন ও আলু আনিয়াছে। মাষকলাইয়ের ডাল, পাখীর মাংস, বাড়ীতে তৈরি অতি উৎকৃষ্ট টাটকা ভয়সা ঘি, দুধ। যুগলপ্রসাদের হাতের রান্নাও চমৎকার।

ভানুমতী, জগরু, জগরুর দাদা, নিছনি—সবাই আজ আমাদের এখানে খাইবে—আমি খাইতে বলিয়াছি। কারণ এমন রান্না উহারা কখনও খাইতে পায় না। বলিলাম—একটু দূরে উহারাও একসঙ্গে সবাই বসুক। যুগলপ্রসাদের দেওয়ারও সুবিধা হইবে। একত্র খাওয়া যাক।

ওরা রাজী হইল না। আমাদের আগে না খাওয়া হইলে উহারা খাইবে না।

পরদিন আসিবার সময় ভানুমতী এক কাণ্ড করিল।

হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল—আজ যেতে দেব না বাবুজী—

আমি অবাক হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কষ্ট হইল।

উহার অনুরোধে সকালে রওনা হইতে পারিলাম না—দুপুরের আহারাদির পর বিদায় লইলাম।

মহালে ফিরিয়া সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া লবটুলিয়া ত্যাগ করিলাম।

আসিবার সময় রাজু পাঁড়ে, গনোরী, যুগলপ্রসাদ, আস্‌রফি টিণ্ডেল প্রভৃতি পাল্কির চারিধার ঘিরিয়া পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে লবটুলিয়ার সীমানার নূতন বস্তি মহারাজটোলা পর্যন্ত আসিল। মটুকনাথ সংস্কৃতে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া আমায় আশীর্বাদ করিল। রাজু বলিল—হুজুর, আপনি চলে গেলে লবটুলিয়া উদাস হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, এদেশে 'উদাস' শব্দের ব্যবহার এবং উহার অর্থের ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশি। মকাই-ভাজা খাইতে খারাপ লাগিলে বলে, 'ভাজা উদাস লাগছে'। আমার সম্পর্কে কি অর্থে উহা ব্যবহৃত হইল

**শান-বাঁধানো** = পাকা।

**আনাজ** = কাঁচা তরি তরকারি, সবজি।

**ভয়সা ঘি** = মোষের দুধে তৈরি ঘি।

**রাজী** = সম্মত।
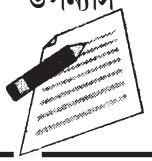
**শব্দার্থ ও টীকা**

**স্বস্তিবাচন** = প্রশস্তি।

ঠিক বলিতে পারিব না।

আমার বিদায় লইয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে কাঁদিয়াছিল। আজ সকাল হইতে আসিয়া সে কাছারির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল—আমার পাল্কি যখন তোলা হইল, তখন চাহিয়া দেখি সে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। মেয়েটি কুন্তা।

নিরাশ্রয় কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি, আমার ম্যানেজারী জীবনের ইহা একটি সৎকাজ। পারিলাম না কিছু করিতে সেই বালিকা মঞ্জীর। অভাগিনীকে কে কোথায় যে ভুলাইয়া লইয়া গেল! আজ সে যদি থাকিত তাহার নিজের নামে জমি দিতাম বিনা সেলামীতে।

**হাপুস নয়নে** = বাষ্পাকুল চোখে।

নাঢ়া বইহারের সীমানায় নক্‌ছেদীর ঘর দেখিয়াই আরও ওর কথা মনে পড়িল। সুরতিয়া ঘরের বাইরে কি করিতেছিল, আমার পাল্কি দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—বাবুজী, বাবুজী, একটু রাখুন—

**নিরাশ্রয়** = আশ্রয়হীন।

পরে সে ছুটিয়া আসিয়া পাল্কির কাছে দাঁড়াইল। ছনিয়াও আসিল পিছু-পিছু।

—বাবুজী, কোথায় যাচ্ছেন?

—ভাগলপুরে। তোর বাবা কোথায়?

—ঝল্লুটোলায় গমের বীজ আনতে গিয়েছে। কবে আসবেন?

—আর আসব না।

—ইস্! মিথ্যে কথা।.....

নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হইয়া পাল্কি হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম।

বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চীৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা। ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে। সবাই কাল তাহাই বলিতেছিল—বাবুজী, আপনার কাজ দেখে আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি, নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হয়েছে!

কথাটা আমিও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে!

দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশে দূর হইতে নমস্কার করিলাম।

**হাস্যদীপ্ত** = হাসিতে উজ্জ্বল।

হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!.....

বহু কাল কাটিয়া গিয়াছে তারপর—পনেরো-ষোল বছর।

বাদাম গাছের তলায় বসিয়া এই সব ভাবিতেছিলাম।

বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে।

**দিগন্তলীন** = দিগন্তে মিশে যাওয়া।

বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের যে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে, সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের

সেই শৈলবেষ্টিত আরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরধারীলাল, কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে।....

আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে, না আসামের চা-বাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও !

কতকাল তাহাদের আর খবর রাখি না।

(সংক্ষেপিত)

**শব্দার্থ ও টীকা**

**বিস্মৃতপ্রায়** = প্রায় ভুলে যাওয়া।

**বনানী** = মহাবন।

**শৈলবেষ্টিত** = পাহাড় ঘেরা।

**অনুতপ্তা** = অনুশোচনাকারিণী।

## 32.4 বিষয়ের রূপরেখা

### অনুবিভাগ - 32.4.1

**[ পনের-ষোল বছর ..... অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি ]**

**বক্তব্যসার :**

'আরণ্যক' উপন্যাসের সূত্রধর সত্যচরণ ১৫/১৬ বছর আগে বি. এ পাস করে অনেক ঘোরাঘুরি করেও চাকুরি জোটাতে পারেননি।

তীব্র অভাবের মধ্যেই তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়। মেসে থাকেন কিন্তু সময়মতো থাকা-খাওয়ার জন্য দেয় অর্থ দিতে পারেন না।

বন্ধু অবিনাশের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সম্প্রতি সত্যচরণ ওকালতি পাস করে বসে আছেন জেনে তিনি তাঁকে জঙ্গলমহলে প্রজা বন্দোবস্তের কাজ নেবার অনুরোধ জানান। সত্যচরণ মান বজায় রাখতে এক কথায় রাজি না হয়ে কিছু সময় চেয়ে নিলেন।

**মন্তব্য:**

'আরণ্যক' উপন্যাস হলেও কাহিনির তেমন জোরালো বাঁধুনি নেই। সূত্রধার সত্যচরণ উত্তমপুরুষে কাহিনিটি বর্ণনা করেছেন। সত্যচরণ ১৫/১৬ বছর আগে বি.এ পাস করলেও বেকার,আবার অবিনাশের দেওয়া চাকুরির প্রস্তাব এক কথায় গ্রহণ করতেও কুণ্ঠা দেখা যায়।

### পাঠগত প্রশ্ন : 32.1

১। **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) সত্যচরণ লেখাপড়া করেছে কতদূর?

(অ) ম্যাট্রিক পাস (আ) বি. এ পাস (ই) এম. এ পাস।
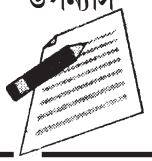
শব্দার্থ ও টীকা

(খ) মেসে সত্যচরণের টাকা —

(অ) প্রায় বাকী থাকে (আ) মাসে মাসে দিয়ে দেন (ই) কখনই দিতে চাইতেন না।

২। **উত্তর লিখুন ঃ**

(ক) সত্যচরণের আর্থিক অবস্থার পরিচয় কীভাবে জানা যায়?

(খ) অবিনাশের দেওয়া চাকুরির প্রস্তাব এক কথায় গ্রহণ করতে সত্যচরণের কুণ্ঠা দেখা যায় কেন?

## অনুবিভাগ - 32.4.2

**[ কী করিয়া চাকুরি ..... জলের কষ্ট নাই ]**

**বক্তব্যসার:**

চায়ের আসরে অবিনাশের সঙ্গে চাকুরিতে যোগ দেবার কথা হবার দু-সপ্তাহ বাদে সত্যচরণ নিজের মালপত্র নিয়ে বি. এন. ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ছোটো স্টেশনে নামলেন।

শীতের বিকেল। দূরের বনের মাথায় কুয়াশা। রেল লাইনের দুপাশে মটর ক্ষেত। সত্যচরণ তাঁর নতুন জীবনের অনেকখানি জুড়ে নির্জনতা থাকবে তা অনুমান করলেন।

সারারাত গোরুর গাড়িতে ১৫/১৬ ক্রোশ অর্থাৎ ৩০/৩২ মাইল পথ চলা হয়ে গেল। খুব ঠাণ্ডা। বাংলার মাটির থেকে এ মাটির ধরন আলাদা। জনবসতি কম। প্রায়ই ছোটো-বড়ো বন।

বেলা দশটায় সত্যচরণ কাছারিতে পৌঁছলেন। ১০/১৫ বিঘের ওপর খড়ের ঘর বনের কাঠ, বাঁশ দিয়ে বানানো। ঘরে শুকনো ঘাস আর বন মটরের সরু গুঁড়ির বেড়া। বেড়াটি মাটি দিয়ে লেপা। জলকষ্ট হওয়ায় পুরানো কাছারির বদলে এই নতুন কাছারি হয়েছে। এখানে একটা ঝরনা আছে।

**মন্তব্য:**

সত্যচরণের নতুন জীবন শুরু হল। একেবারে শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে চলে এলেন। মাটি দিয়ে লেপা বেড়ার ঘর। আশেপাশে ছোটো বড়ো বন। কাছেই ঝরনা, নির্জনতায় মোড়া।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.2

১। **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) সত্যচরণ স্টেশনে নেমেছেন কোন্ সময়ে?

(অ) শীতের বিকেলে (আ) শীতের সকালে (ই) শীতের সন্ধ্যায়।
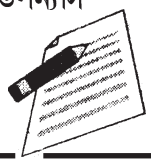
শব্দার্থ ও টীকা

(খ) কাছারিতে সত্যচরণ কখন পৌঁছলেন?

(অ) সকাল সাতটায় (আ) সকাল আটটায় (ই) সকাল দশটায়।

(গ) গোরুর গাড়িতে সত্যচরণকে কতটা পথ যেতে হয়েছিল?

(অ) প্রায় দশ-বারো ক্রোশ

(আ) প্রায় চোদ্দো ক্রোশ (ই) প্রায় পনেরো-ষোলো ক্রোশ।

২। **অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন ঃ**

গোরুর গাড়ি করে যেতে যেতে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সত্যচরণের মানসিক অবস্থা কীরকম হয়েছিল লিখুন।

৩। কী করে সত্যচরণ চাকরি পেল অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

## অনুবিভাগ - 32.4.3

**[ জীবনের বেশির ভাগ সময় ..... অবিনাশকে কথা দিতাম না।]**

**বক্তব্যসার:**

সত্যচরণ কলকাতার অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে এই নতুন পরিবেশে এসে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। এখানকার বিপুল নির্জনতা তাঁকে অস্থির করে তুলল। এখানকার মানুষের ভাষা বোঝেন না, তারাও সত্যচরণের ভাষা বোঝেনা ; যে কাজে আসা এখানে তাও শুরু করা যায়নি। কলকাতা থেকে আনা বই পড়ে তাঁর সময় কাটছে। এখানে কটা টাকার জন্যে আসাটা তাঁর ভুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

এক রাত্রে বৃদ্ধ মুহুরি গোষ্ঠ চক্রবর্তী তাঁর ঘরে এলেন। ভদ্রলোকের বাড়ি বর্ধমানে। তাঁর সঙ্গে সত্যচরণ বাংলা কথা বলে একটু স্বস্তি বোধ করেন। তিনিই সত্যচরণকে এখানকার মানুষ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে বললেন। তাঁরও এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত। কিন্তু এখন দুদিন এ জায়গা ছেড়ে থাকতে পারেন না। এখানে থাকলে জঙ্গলই আপন করে নেবে। একবার মোকদ্দমার কাজে মুঙ্গেরে গিয়ে গোষ্ঠবাবু জঙ্গলের জন্য এক গভীর টান অনুভব করেছিলেন। গোষ্ঠবাবু ৭/৮ বছর আগের এক ডাকাতির ঘটনা উল্লেখ করে সত্যচরণকে বন্দুক শিয়রে রেখে শুতে পরামর্শ দেন।

গোষ্ঠবাবু চলে গেলে জানলার ধারে গিয়ে সত্যচরণ বাইরের আকাশের চাঁদের ও প্রকৃতির ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন বটে তবুও এখানে আসা যে তার ভুল হয়েছে এটাই তাঁর মনে হতে লাগল।

**মন্তব্য:**

নতুন পরিবেশে এসে সত্যচরণের পুরানো জীবনের কথা বারে বারে মনে আসছিল। বাধ্য হয়ে নতুনকে গ্রহণ করলেও পুরানোর প্রতি টান মানুষের সহজে যায় না।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.3

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

১। গোষ্ঠ চক্রবর্তী কে?

২। গোষ্ঠবাবুর বাড়ি কোথায়?

৩। সত্যচরণকে শিয়রে বন্দুক রেখে ঘুমোবার পরামর্শ কে দিয়েছিলেন?

৪। কাছারিতে চাকরি করতে এসে সত্যচরণের প্রথম দিন-দশেক কীভাবে কেটেছে অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

## অনুবিভাগ - 32.4.4

**[ কাছারির অনতি দূরে ..... বড় কষ্ট তো ওদের ]**

**বক্তব্যসার:**

কাছারির কাছেই একটি টিলায় গ্র্যাণ্টসাহেবের বটগাছ নামে এক বড়ো বটগাছ আছে। একদিন বিকেলে সত্যচরণ সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে এই টিলার উপর উঠলেন। সেখানে তাঁর মন কলকাতার কলুটোলার মেস, কাপালীটোলার ব্রিজের আড্ডা, তাঁর গোলদীঘির প্রিয় বেঞ্চ ইত্যাদির জন্য ব্যথিত হয়ে উঠল। এখানকার নির্জনতা ও আরও অজ্ঞ মানুষদের কথা ভেবে তিনি বিষণ্ণ হলেন এবং ঠিক করলেন সামনের মাসটা কোনোরকমে কাটিয়ে দিয়ে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তাঁর কলকাতার চেনাজগতের কোলাহলে আবার মিশে যাবেন। কলকাতার মানুষদের জন্য সেদিন তাঁর মন কেঁদে উঠল। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে বই বিক্রির দোকানের মুসলমান মালিকটির স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে উঠল।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে সত্যচরণ বই নিয়ে বসেছেন এমন সময় সিপাহী মুনেশ্বর তাঁকে সেলাম দিয়ে এসে দাঁড়াল। সত্যচরণ ইতিমধ্যে কিছু দেহাতি হিন্দি বলতে শিখেছিলেন। সত্যচরণ বুঝতে পারলেন মুনেশ্বর একখানা লোহার কড়া কিনতে চায়। সেজন্য দরকার মুহুরির কাছে সত্যচরণের লিখিত নির্দেশ। মুনেশ্বরের কাকুতিমিনতিতে তার প্রতি সত্যচরণের মায়া হল। তিনি মুহুরিকে নির্দেশ দিলেন। সেই কড়া নিয়ে মুনেশ্বর এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে একটা আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার ছবি দেখলেন। এদের কষ্টে সত্যচরণ সেদিন খুবই ব্যথা পেলেন এবং এই সামান্য জিনিস কিনতে পেরে যে আনন্দের প্রকাশ দেখলেন তাতে তাঁর মনে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। সেদিন এই লোকগুলোকে তাঁর কাছে বেশ ভালো মনে হল।

**মন্তব্য ঃ**

একদিকে কলকাতার চেনা জগত ছেড়ে এসে সত্যচরণের মানসিক কষ্ট আরম্ভ হল। ফেলে আসা

শব্দার্থ ও টীকা

স্মৃতির ভারে কাতর। আবার অন্যদিকে মুনেশ্বর এর মতো স্থানীয় মানুষদের সহজ সরল কথাবার্তা তাঁকে মুগ্ধ করে।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.4

১। **একটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ**

(ক) সত্যচরণ কোথাকার দোকানে দাঁড়িয়ে পুরনো বই ও মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতেন?

(খ) একটি লোহার কড়াই-এর দাম কত?

২। একটি লোহার কড়াইয়ে কত সুবিধে বলে মুনেশ্বরের ধারণা—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩। সত্যচরণ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ভাবছিলেন কেন — অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৪। মুনেশ্বরের কষ্টে সত্যচরণ ব্যথা পেয়েছিলেন কেন — অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

## অনুবিভাগ - 32.4.5

**[ একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না ..... চির অপরিচিত রহিয়া গেল ]**

**বক্তব্যসার:**

দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে কাছারির ছুটিতে সারা দিন সিপাইরা ঢোল বাজিয়ে হোলি খেলেছে। সত্যচরণ রাত ১টা পর্যন্ত নিজের ঘরের টেবিলে বসে হেড অফিসে চিঠি লিখেছেন। প্রবল শীত। সত্যচরণ জানলা দিয়ে পূর্ণিমা রাত্রির অপরূপ শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন। এখানে এসে প্রথম তিনি প্রকৃতির এই রূপ দেখলেন।

সত্যচরণ বাইরে এলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নায় সারা এলাকা প্লাবিত। বনের এমন রূপ-মাধুর্য তিনি জীবনে তখনও দেখেননি।

**মন্তব্য:**

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন সত্যচরণ। জ্যোৎস্নার এ হেন রূপের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। মুগ্ধ তিনি।
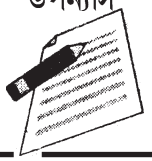
শব্দার্থ ও টীকা

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.5

১। কাছারির সিপাইরা হোলির উৎসব কীভাবে পালন করেছিল—একটি বাক্যে লিখুন।

২। সত্যচরণ হোলির দিনে অনেক রাত পর্যন্ত কী করেছিলেন—একটি বাক্যে লিখুন।

৩। **অনধিক পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন ঃ**

'আমি অনধিকার-প্রবেশ করিয়া ভালো করি নাই।'—কোথায় প্রবেশ করে সত্যচরণের এরকম মনে হল কেন?

## অনুবিভাগ - 32.4.6

**[ সাদা কথায় ..... সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয় ]**

**বক্তব্যসার:**

সত্যচরণের কাছারি বাড়িতে থাকার কয়েক মাস পর শুরু হল প্রচণ্ড জলকষ্ট। মাঘ মাস থেকে বৈশাখ পর্যন্ত কোনো বৃষ্টি হয়নি। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষণপুর, পূবে ফুলকিয়া, বইহার ও লবটুলিয়া থেকে পশ্চিমে মুঙ্গেরের সীমানা সব নদ-নদী, খাল,ডোবা-পুকুর সব শুকিয়ে গেল। সারাদিন নদীর শুকিয়ে যাওয়া ধারার বালি খুঁড়ে সামান্য একটু জল মেলে অনেক কাদা-বালি ছেঁকে। ছোটো বালির পাতকুয়া থেকে তিন বালতি জল মিলত সকাল থেকে দুপুর গাড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত মেহনত করে।

দুপুরে তামাটে আকাশ আগুন ঢালত ; আধপোড়া বনঝাড় আর লম্বা ঘাসের বন দেখে ভয় লাগত ; জ্বলন্ত আগুনের গোলা বেরিয়ে আসত সূর্য থেকে ; আগুনে বাতাসের হলকা ছুটত।

একদিন দুপুরে হরিতকী গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সত্যচরণ এখানকার দুপুরের ও বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরের কথা স্মরণ করে বলেছেন বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর এমন অগ্নিবর্ষী নয়। এই দুপুরের রুদ্রমূর্তির মধ্যে সত্যচরণ এক অদ্ভুত ভয়ংকর সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন।

কাছারি থেকে তিন মাইল দূরে বনে-ঘেরা কুণ্ডীতে সামান্য একটু জল থাকলেও তা গভীর কাদা ও ধাতব গন্ধের জন্য পানের উপযুক্ত নয়।

এক সন্ধ্যায় উত্তাপ-মাত্রা কম হলে সত্যচরণ ঘোড়ায় চড়ে কুণ্ডীর পাশের বালিয়াড়িতে গেলেন। সূর্য তখন অস্তগামী। কাছারির জল বাঁচাতে ঘোড়াটিকে জল খাওয়াতে গিয়ে দেখলেন তিনটে বুনো মহিষ আর পাঁচটা বিষাক্ত সাপ ওখানে জলপান করছে। আর এগিয়ে গেলেন না। মোষগুলির বিবরণ শুনে সবাই চমকে উঠে তাঁর বেঁচে যাওয়ার জন্য আনন্দপ্রকাশ করল।

তারপর থেকে এই কুণ্ডী বুনো জন্তুদের জলপানের এক কেন্দ্র হল। সত্যচরণ খবর পেলেন সেখানে বুনো হরিণের পাল, নীলগাই, বুনো শুয়োর প্রভৃতি জন্তুরা জল খেতে আসছে। সত্যচরণ এক
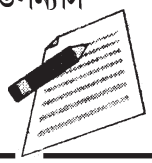
শব্দার্থ ও টীকা

জ্যোৎস্নারাতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখলেন দুটি নীল গাই, দুটি হায়েনা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে আর জলপান করছে—আর এই দুই দলের মাঝখানে ছিল একটি ২/৩ মাসের ছোটো নীল গাইয়ের বাচ্চা। এমন দৃশ্য কল্পনা করাও যায় না। সত্যচরণের সাথে দু'তিনটে বন্দুক থাকলেও করুণ দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দুক ব্যবহার করা গেল না।

**মন্তব্য:**

সৌন্দর্যপিপাসু সত্যচরণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তির ভেতরও উপলব্ধি করেন ভয়ংকর সৌন্দর্যকে। সত্যচরণ শিকারে বেরিয়েও শিকার করেননি হায়না আর নীল গাইকে। পিপাসার্ত জানোয়ারগুলো জলপান করছে আর ভীতচোখে উভয়ে উভয়কে দেখছে। হাতে বন্দুক থাকলেও ওই করুণ দৃশ্য দেখে তিনি বন্দুক চালাতে পারলেন না।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.6

১। কুণ্ডীর ধারে গিয়ে সত্যচরণ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন—দৃশ্যটি কী? অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

২। সত্যচরণ জঙ্গলের ভেতর ওই কুণ্ডীর ধারে গেলেন কেন—অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

৩। কাছারিতে কথাটা তখনই রাষ্ট্র হইয়া গেল—কথাটি কী?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৪। কুণ্ডীতে শিকার করতে গিয়ে সত্যচরণ যে দৃশ্যটি দেখেছিলেন তাকে করুণ বলে মনে হল কেন — অনধিক পাঁচটি বাক্যে তা লিখুন।

## অনুবিভাগ - 32.4.7

**[ একদিনের ঘটনা ..... গিয়া পৌঁছিল। ]**

**বক্তব্যসার:**

দুপুরে গরমে ক্লান্ত হয়ে সত্যচরণ যখন বই পড়ছেন সে সময় রামবিরিজ সিং এসে জানাল কাছারির পশ্চিমদিকে উঁচু ডাঙার উপর একজন হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছে। চারিদিকে ভিড়। দুজন সিপাইকে লোকটাকে আনতে পাঠান হল।

লোকটা এলে দেখা গেল তার পরণে ফর্সা ধুতি হলেও গায়ে জামা নেই, চেহারা ভালো, রং ফরসা কিন্তু মুখের চেহারা ভীষণ। গালের কশ বেয়ে ফেনা ঝরছে, জবাফুলের মতো লাল চোখে পাগলের দৃষ্টি। ঘরের দাওয়ায় এক বালতি জল দেখে সে পাগলের মতো সে দিকে গেল। তখন সেই বালতি সরিয়ে তাকে হাঁ করিয়ে দেখা গেল তার জিভ বীভৎস ফুলেছে। জিভটা সরিয়ে একপাশ থেকে মুখে জল দিতে লোকটি আধঘন্টা পরে একটু সুস্থ হল। তার যথোচিত পরিচর্যা করা হল। পরে জানা
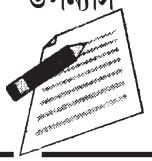
শব্দার্থ ও টীকা



গেল লোকটার বাড়ি পাটনা। গালা চাষের জন্য কুল বাগান খুঁজতে পূর্ণিয়ায় এসে দিশা হারিয়েছে। ভয়ংকর তাপে পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে ও তীব্র পিপাসায় তার এই হাল হয়েছে। অসহ্য গরমে ও কষ্টে জামাটা দেহ থেকে খুলে সে কোথায় ফেলেছে জানে না।

এই ভয়ংকর গরমের মধ্যে সত্যচরণের কাছে খবর হল যে কাছারি থেকে মাইলখানেক দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বনে আগুন লেগেছে আর রোদ্দুরে শুকনো ও আধা শুকনো লম্বা ঘাস ও গাছপালায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সে ছড়িয়ে পড়ায় সাহায্য করছে পশ্চিমে বাতাস।

দ্রুত আগুন ছুটে আসছে দেখে সিপাইদের কাছারি থেকে সব জিনিস বার করার নির্দেশ দেওয়া হল। কিছু লোক আগুন ও কাছারির জঙ্গল কেটে দিতে লাগল। বাথানওয়ালা চরির দু-দশজন প্রজা এসে ওদের সঙ্গে হাত মেলাল। সে সময় জঙ্গল ভেঙে পশ্চিম থেকে পূর্বে ছুটছে নীলগাই, শেয়াল, খরগোস ও বন্য শূকরের দল। পিছনে ছিল এক ঝাঁক লাল হাঁস।

বিশ মিনিটের মধ্যে আগুন এল। দশ-পনেরো জন ঘন্টাখানেক আগুনের সঙ্গে লড়ল। জল নেই, শুধুই গাছের কাঁচা ডাল আর বালি। কাছারির সব জিনিস বাইরে। কাছারির উঠান ও পরিষ্কার করা স্থানে বাধা পেয়ে আগুনের স্রোত ছুটল উত্তর ও দক্ষিণ বেয়ে পূবদিকে। কাছারি বেঁচে গেল।

কয়েকদিন বাদে খবর এল কারো ও কুশী নদীর তীরে পালাতে গিয়ে কাদায় আটকে মারা গেছে আট-দশখানা মোষ, দুটো চিতাবাঘ আর কয়েকটি নীলগাই।

**মন্তব্য :**

সত্যচরণের প্রখর দৃষ্টি, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে প্রকৃতির বুকে যখন আগুন লাগে নীল গাই, শেয়াল, খরগোস, বুনো শুয়োর যখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ছুটতে থাকে—সত্যচরণ মনে ব্যথা পান। পাটনায় বাড়ি যে লোকটার—গরমে জলের জন্য যে পাগল—তার যথোচিত পরিচর্যা করার নির্দেশ দেন তিনি।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.7

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১। রামবিরিজ সিং যখন এল, সত্যচরণ কী করছিলেন?

২। কাদায় আটকে কোন্ কোন্ জন্তু মারা গেল?

৩। 'তাহার মুখের আকৃতি অতি ভীষণ, গালের দুই কশ বাহিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল, উন্মাদের দৃষ্টি।'—লোকটির এ অবস্থা হল কেন অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৪। আগুন দেখে পশু পাখিদের যে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল তা পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৫। আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত কাছারিটা কীভাবে রক্ষা করা গেল অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।
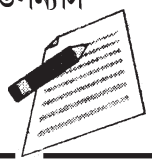
শব্দার্থ ও টীকা

## অনুবিভাগ - 32.4.8

**[ প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে ..... কড়ার হইয়াছে। ]**

**বক্তব্যসার ঃ**

রাজু পাঁড়ে দরিদ্র কিন্তু সাত্বিক প্রকৃতির। তার সঙ্গে পরিচয় হল ম্যানেজার বাবুর। রাজুকে বড়ো অদ্ভুত লাগল। চাষ আবাদ বাড়াবার কোনো চেষ্টা নেই তেমন। ম্যানেজারের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় তার সময় নেই। কারণ সে ভক্ত মানুষ। পুজো-আর্চায় সময় চলে যায়। চাষের জন্য জঙ্গল সাফ করতে 'দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে কেড়ে নেন— কানে কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন যাতে বিষয় সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।' এমনতর দার্শনিক রাজু পাঁড়ে। তাকে দিয়ে চাষবাস কী করে চলবে?

সত্যকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির রাজু পাঁড়ে সাত-আটমাস চীনা ঘাসের দানা খেয়েই অনায়াসে কাটিয়ে দেয়।

ম্যানেজার সত্যচরণের চোখে পড়ে রাজুর আর এক রূপ। সন্ধ্যার দিকে ও প্রায় চুপ করে হরতকী গাছটার তলায় বসে থাকে। হাতে কোনো দিন খাতা থাকে।

রাজু পাঁড়ে কবিও বটে।

**মন্তব্য ঃ**

লেখক তার 'আরণ্যক' গ্রন্থে সন্ধান দিয়েছেন অরণ্য প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের। তার সাথে খুঁজে পেয়েছেন অরণ্য অঞ্চলের অনেক মানুষকে। এরা এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে। প্রকৃতির মতোই সহজ সরল এদের মন। তাদের মধ্যে অন্যতম রাজু পাঁড়ে।

লেখক রাজু পাঁড়ের দার্শনিক প্রকৃতি ও সেবা ধর্মের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.8

**১। ডানদিক থেকে ঠিক অংশ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান**

(ক) রাজু পাঁড়ে— (১) লবটুলিয়া বইহারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দু বিঘা জমি দেওয়া হল।

(খ) রাজু পাঁড়েকে— (২) সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক।

(গ) রাজু পাঁড়ে — (৩) একজন গৌরবর্ণের সুপুরুষ ব্রাহ্মণ।

**২। নীচে যে মন্তব্যগুলো ঠিক সেগুলো বেছে নিয়ে লিখুন—**

(ক) রাজু পাঁড়ে খুব মন দিয়ে চাষ করে।

(খ) রাজু চীনার দানাই চাষ করেছে তাই তার ভাগ দেয়নি।

(গ) রাজুর পুজো আর্চার দিকেই বেশি মনোযোগ।

(ঘ) রাজু লেখাপড়া জানে না।

(ঙ) ম্যানেজার রাজুকে ভালো বেসে ফেলেছিলেন।

৩। **সংক্ষেপে উত্তর দিন —**

(ক) কী করে জানা যায় রাজু সাত্ত্বিক প্রকৃতির?

(খ) রাজু পাঁড়ের চরিত্রের কী কী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়?

## অনুবিভাগ - 32.4.9

**[ কয়েক বারের কথা ..... পুনরাস্বাদনের লোভে ]**

**বক্তব্যসার:**

সত্যচরণ এই জঙ্গল এলাকায় থেকে অনুভব করলেন প্রকৃতির প্রকৃত ভক্ত হলেই তবে তাঁর সেরা দানটা মেলে। কিন্তু একমনে প্রকৃতি ভালোবাসে এমন লোকের সংখ্যা কম।

লবটুলিয়ার মাঠে দুধলি ঘাসের ফুল ফুটে বসন্ত আসার কথা জানিয়ে দেয়। সরু লম্বা ঘাসের ডাঁটায় নক্ষত্র আকারের হলদে রঙের দুধলি ফুল ধরে গাঁটে গাঁটে। ভোরে মাঠ আলো করে থাকে কিন্তু বেলা বাড়লে ফুল কুঁকড়ে কুঁড়ি হয়ে যায় আবার সকালে সেগুলি ফোটে।

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও মহালিখারূপের পাহাড়ে দেখা যায় রক্তপলাশের বাহার আর শালমঞ্জরীর সুবাস বাতাস মাতিয়ে রাখে কিন্তু এখানে কোকিল, দোয়েল ডাকে না। এসময় সত্যচরণের মন বাংলায় ফেরার জন্যে আকুল হয়ে উঠত। বিদেশে গিয়েই সত্যচরণ বুঝল নিজের জন্মভূমিকে সে কত ভালোবাসে।

একদিন পূর্ণিয়া থেকে উকিলের তার পেয়ে সত্যচরণ জানলেন যে পরদিন সকাল দশটার মধ্যে সেখানে না গেলে মামলায় তার স্টেটের হার হবে। রাতের ট্রেন একটি। যখন তার এল তখন ১৭ মাইল দূরে কাটারিয়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরা অসম্ভব। তাই তহশীলদার সুজন সিংকে নিয়ে রাতে সে বিপদসঙ্কুল পথে সত্যচরণ ঘোড়ায় চড়ে পূর্ণিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওঁরা দুজন পাশাপাশি চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে। মাথার উপর দেখা দিল কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ। উঁচু-নীচু পথ। চাঁদের আলোয় সাদা বালি ঝিকমিক করছে। দূরের বন-জঙ্গলদের শীর্ষদেশ একটানা সরলরেখায় চলে গেছে। নিস্তব্ধ নির্জন এই বনভূমিকে সত্যচরণের অন্য এক দেশ বলে মনে হয়েছে।

ওঁরা পথ হারালেন। কিছু খোঁজাখুঁজিতে পথও মিলল। অনেকক্ষণ ছুটে ঘোড়া দুটো হাঁপাচ্ছে। সুজন ও সত্যচরণের গায়ে ঘাম। আরো ঘণ্টা দুই চলার পর ওঁরা এলেন পূর্ণিয়া শহরে।

শব্দার্থ ও টীকা

ওঁরা কাজ শেষ করে তখনই ফিরলেন না রাতে চাঁদের আলোয় প্রকৃতির রূপ উপভোগ করার লোভে। রাতে ওঁরা রওনা দিলেন।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.9

১। 'বনপথে দুটি মাত্র প্রাণী আমরা'—দুজনের নাম কী? তাঁরা কোথায় যাচ্ছিলেন? অনধিক দুটি বাক্যে লিখুন।

২। ঘড়িতে রাত প্রায় চারটা। শেষরাতের অন্ধকারে ঘোড়ায় চেপে চলতে চলতে দুজনেরই ভয় হচ্ছিল কেন?—অনধিক দুটি বাক্যে লিখুন।

## অনুবিভাগ - 32.4.10

**[ লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত ..... যোগাড় করিয়া আনিল ]**

**বক্তব্যসার:**

লবটুলিয়ার উত্তরপ্রান্তে একটা বড়ো হ্রদের মতো জলাশয় আছে। এখানে বড়ো জলাশয়কে বলে কুণ্ডী। আর এই হ্রদটির নাম সরস্বতী কুণ্ডী। এর তিন দিকে ঘিরে আছে বন। কুণ্ডীর নীল জল ; মাথার উপর নীল আকাশ। দূরে পাহাড়। আর অর্ধবৃত্তাকারে ঘেরা কোথাও ঘন আবার কোথাও হালকা বন। বনের শ্যামল রূপ সরস্বতীর জলে ছায়া ফেলে। সত্যচরণের মনকে এই পরিবেশ মুগ্ধ করেছে।

সত্যচরণ প্রায়ই এখানে আসতেন। কখনও এক শিলাখণ্ডে বসতেন ; কখনও আপন মনে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন আর বুনো ফল সংগ্রহ করতেন। অজস্র পাখির আবাস হল সরস্বতী তীরবর্তী গাছগুলো।

নাঢ়া বইহার এলাকায় প্রজাবাসীর জন্য জরিপ চলছে। সেখানে প্রায়ই যেতে হয় সত্যচরণকে। আর ফেরার সময় সরস্বতী কুণ্ডী ঘুরে যেতেন। অজানা ফুলের গন্ধ চারিদিকে মাতিয়ে তুলেছে। সেখানে কত রং বেরঙের পাখি—শ্যামা, শালিক, হরটিট, বনটিয়া, ফেজান্টক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো। সরস্বতীর নীলজলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখি প্রভৃতি জলচর পাখি। তাদের কানফাটা কূজনে চারিদিক মুখরিত।

সার্ভে-ক্যাম্প থেকে ফেরার সময় একদিন সত্যচরণ সরস্বতী তীরের বনপথ দিয়ে আসছিলেন। দেখেন একটি লোক মাটি খুঁড়ছে। তার সঙ্গে একটা চটের থলে। তার মধ্যে থেকে একটা কোদালের মাথা উঁকি দিচ্ছিল। পাশে পড়ে আছে একটা শাবল ; ছড়ানো আছে কতকগুলি কাগজের মোড়ক। নিজের পরিচয় দিয়ে সে জানাল তার নাম যুগলপ্রসাদ। লবটুলিয়ায় পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই।

সত্যচরণকে যুগলপ্রসাদ জানালো সে মাটিতে গাছের বীজ পুঁতছে। পূর্ণিয়ার এক সাহেবের বাগানের রাঙা রাঙা ফুলের এক বিলিতি লতা গাছের বীজ এখানে পুঁতছে। বনকে সে আরও সুন্দর ও রঙীন করে তুলবে। এর জন্যে সে পারিশ্রমিক পাবার আশা করে না। এমনকি এই কাজে বিনাস্বার্থে সে পয়সাও ব্যয় করেছে। এসব মানুষের জুড়ি নেই।

যুগলপ্রসাদ জানায় যে এ কাজ তার প্রথম নয়। লবটুলিয়ার যত ফুল ও ফুলের লতা আছে সেসব দশ-বারো বছর আগে পূর্ণিয়া থেকে ও দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের জঙ্গল থেকে এনে সে লাগিয়েছিল। এখন ওসব ফুলের জঙ্গল হয়ে গেছে। বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে নতুন ফুল ফোটানোই তার শখ।

যুগলপ্রসাদের বাড়ি ধরমপুরে। ছেলেবেলায় দশ-পনেরো ক্রোশ দূরে কুশী নদীর ধারে সে মহিষ চরাতে যেত। মাঠের বুনো ভাণ্ডীর ফুলের রূপ তাকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই ফুলের বীজ নিয়ে সে লোকের বাড়ির পোড়ো জমিতে লাগিয়ে এই ফুলের জঙ্গল তৈরি করেছে। সেই থেকে এই কাজের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে।

সত্যচরণ ওর এই নিঃস্বার্থ গাছপালা-ফুলের প্রতি ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দুজনে মিলে তাঁরা সরস্বতীতে পদ্ম ফোটানো ও লবটুলিয়ার জঙ্গলে নতুন গাছপালা বসিয়ে সাজাবার শপথ নিলেন।

সত্যচরণ যুগলপ্রসাদকে একটা দশটাকা বেতনের মুহুরির কাজ জুটিয়ে দিলেন।

যুগলপ্রসাদ নানা জায়গা থেকে বীজ ইত্যাদি যোগাড় করত ও সেগুলি লবটুলিয়ার জঙ্গলে বসিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত।

**মন্তব্য:**

যুগলপ্রসাদের মতো এমন গাছপাগল খামখেয়ালি লোক এ যুগে বিরল। জঙ্গলে নতুন নতুন গাছ বসিয়ে জঙ্গল বাঁচানোর আকাঙ্খা তাঁর সহজাত।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.10

১। **একটি বাক্যে লিখুন ঃ**

(ক) সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখির সংখ্যা অত্যন্ত বেশি কেন?

(খ) 'সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ-বিস্ময়ে বড়ো বড়ো চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে, এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব।'—এখানে 'সে' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?

২। 'লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বনভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যেখানে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা।'—লোকটি সম্পর্কে যা
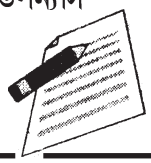
শব্দার্থ ও টীকা

জেনেছেন পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

## অনুবিভাগ - 32.4.11

**[ পনের দিন এখানে ..... কথা খুঁজিয়া পাই না ]**

**বক্তব্যসার:**

পনের দিন সত্যচরণ বাধ্য হয়েই বুনোজীবন যাপন করেছেন। বন-ধুঁধুলির তরকারি, কাঁকরোল তথা মিষ্টি আলু এনে তাই ভাজা বা সিদ্ধ—এসব খেয়েই তিনি কাটালেন।

ফুলকিয়া বইহারে হাড়ভাঙা শীত। কাজকর্ম সেরে সত্যচরণ সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলেন। জঙ্গলের ধারে কিছু লোকের চিৎকারে তাঁর ঘুম ভাঙল। এমন সময় একজন এসে জানাল ঝুপড়ি থেকে বাঘে একটা ছোটো ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে।

জঙ্গলের ধারেই একজন গঙেগাতা প্রজার ঝুপড়ি। এক মা তার ছ-মাসের বাচ্চা নিয়ে ছিল—ঝুপড়ির মধ্যেই আগুন জ্বালা। ধোঁয়া বেরোবার জন্যে ঝাঁপটায় একটু ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক দিয়েই বাঘটা এসে শিশুটিকে নিয়ে চলে গিয়েছে।

অনেক বকাবকির পর জন দশেক লোক মশাল হাতে টিন পেটাতে পেটাতে জঙ্গলে ঢুকল। কিন্তু কোনো খোঁজই মিলল না।

পরের দিন বেলা দশটায় মাইল দুই দূরে বড় আসান গাছের তলায় রক্তাক্ত দেহাবশেষটা পাওয়া গেল।

সদর কাছারির অভিজ্ঞ শিকারি বাঁকে সিং জমাদারকে জানালে সে বলল যে মানুষ খেকো বাঘ খুবই ধূর্ত হয়। অন্যেরাও আক্রান্ত হতে পারে।

ঠিক তিনদিন পরে এক রাখালকে বাঘে নিয়ে গেল। তারপর থেকে লোকে ঘুম বন্ধ করে টিন পেটাত, কাশের ডাঁটা জ্বালিয়ে আগুন জ্বালাত। সত্যচরণ ও বাঁকে সিং প্রহরে প্রহরে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতেন। তারমধ্যেই একদিন বুনো মোষ এসে বনের ফসল নষ্ট করল।

এখানকার লোক খোলা আকাশের নীচে কাশের ঝুপড়ির মধ্যে দিন কাটায়, তা ভেবে সত্যচরণ অবাক হয়েছিলেন।

সত্যচরণের ঘরের দু-তিনশ হাত দূরে দক্ষিণ ভাগলপুর থেকে আগত কাটুনি মজুররা ঝুপড়িতে ছিল।

কৌতূহলবশত সত্যচরণ তাদের মধ্যে গেলে ওদের মধ্যে বৃদ্ধ মানুষটি সেলাম জানিয়ে আগুন পোহাবার অনুরোধ জানাল। শীতকালে আগুন পোহানো অনুরোধ করাই ওখানকার রীতি।
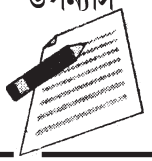
শব্দার্থ ও টীকা



সত্যচরণ কৌতূহলে ঝুপড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখেন তাদের মেঝেতে শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই নেই। বিছানা-আসবাবপত্র কিছুই নেই। কাঁসার জামবাটিটা একমাত্র বাসন। পরনের কাপড় ছাড়া আর কারও কোনো কাপড় নেই ; রাতে গায়ে দেবার লেপ কাঁথা নেই। সম্বল শুধু কলাইয়ের ঢাল করা ভূষি। ওদের মধ্যেই বাচ্চারা ঢুকে থাকে আর বড়রা ভূষি গায়ে চাপা দিয়ে থাকে। ভাত বা রুটি জোটে না। মকাই সেদ্ধ বা ঘাটো নুন আর শাক দিয়ে খায়। সত্যচরণের ভারত দর্শন হল।

ওদের কাছ থেকে সত্যচরণ জানলেন ওরা দেশে দেশে ঘুরে ফসল কেটে বেড়ায়।

এই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে, বাঘের মুখে সন্তানকে দিয়ে, চরম ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নীচে ঝুপড়িতে বসবাস করে এরা সব কিছু সহ্য করছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন এরা ভীত-সন্ত্রস্ত নয় ; এটাই ওদের স্বাভাবিক জীবন। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, সবই ওদের জীবনের অঙ্গ।

সেই রাতে ওই মেয়েটি সত্যচরণকে অখিলকুচা পাহাড়ের নীচে বুনো হাতির কথা জানায় ও বলে ওসব ওদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ফুলকিয়ার তহশীলদারের পরামর্শমতো সত্যচরণ ওদের ওপর জমিদারের খাজনা ধার্য করেন। সত্যচরণের নজরে এল মাড়োয়ারী মহাজনরা ওজনে নিরীহ প্রজাদের ঠকাচ্ছে। তখন তিনি পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের ব্যবসায়ীদের সমস্ত কাঁটা ও দাঁড়ি পরীক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। কিছু ক্ষেত্রে ঠকানোর প্রমাণ হওয়ায় ওদের মহাল থেকে বার করে দেওয়া হল।

ওখানে নগদ পয়সার কারবার বিশেষ ছিল না। ফিরিওয়ালাদের জিনিসের দাম ওরা সরষে দিয়ে মেটাত এবং ব্যবসায়ীরা নিরীহ মানুষদের কাছ থেকে দামের থেকে বেশি পরিমাণ তা আদায় করত।

শোনা গেল দশরথ নামে একজন ননীচোর নাটুয়া সেজে প্রজাদের কাছ থেকে বিস্তর পয়সা আদায় করেছে। অথচ খাজনা না দিয়েই চলে যাচ্ছে। সিপাইদের হাঁকে সে দৌড়তে শুরু করল। শেষে সে দেখাল তার কাছে মাত্র তের আনা পয়সা আছে। সে খাজনার বদলে নাচ দেখাতে রাজি হল। আর তার মুখে রং মেখে মাথায় ময়ূরপাখা গুঁজে বালকের ভঙ্গিতে হেলে দুলে নাচতে নাচতে গান গাইল। সকলে কৌতুকের সঙ্গে তা উপভোগ করল। নাচশেষে হাততালি দিয়ে সত্যচরণ তার প্রশংসা করলেন।

দিন দশ-বারোর মধ্যে সব ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়তি লোক যে যার জায়গায় চলে গেল।

**মন্তব্য :**

এখানে পয়সার চলন সব জায়গায় নেই। দরিদ্র মানুষেরা বিনিময় প্রথায় মাল দেওয়া নেওয়া করে। একঘেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে বাঁচতে চাই হাসি আর আনন্দ। অন্য কোনো মাধ্যম না থাকায় সেখানে সরল মানুষের উপযোগী নাচ-গান পরিবেশিত হত। মানুষ অন্তর দিয়ে তা উপভোগ করত।

শব্দার্থ ও টীকা

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.11

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১। (ক) নক্‌ছেদী ভকতের বাড়ির ছেলেমেয়েরা শীতের রাতে শীত নিবারণ করে কীভাবে? —দুটি বাক্যে লিখুন।

(খ) তাদের খাদ্য কী? অনধিক দুটি বাক্যে উত্তর লিখুন।

২। মঞ্চী ও নক্‌ছেদী ভকতদের জীবনযাত্রা অনধিক পাঁচটি বাক্যে বর্ণনা করুন।

৩। 'ননীচোর নাটুয়া'র আসল নাম কী? তার বাড়ি কোন্ জেলায়? দুটি বাক্যে লিখুন।

৪। 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ দেখে হাসি পাবার কারণ অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

## অনুবিভাগ - 32.4.12

**[ একদিন বেড়াইয়া ফিরিবার সময় ..... চলিয়া গেলে দুঃখিত হইলাম ]**

**বক্তব্যসার:**

একদিন সত্যচরণ বেড়িয়ে ফেরার পথে নক্‌ছেদী ভকতের খুপরিতে গেলেন। নক্‌ছেদী সেলাম জানিয়ে মঞ্চীকে বসার জায়গা দিতে বলল। মঞ্চী কাশের ডাঁটায় বোনা একটা চেটাই পেতে দিল।

সত্যচরণ মঞ্চীকে কোথায় চলে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় সে পূর্ণিয়া কিষাণগঞ্জ অঞ্চলে যাবে বলে তা জানাল। ইতিমধ্যে মঞ্চী বালিকার স্বভাবে তার দেখা সবই মজার জিনিসের বর্ণনা দিতে লাগল।

বৃদ্ধ নক্‌ছেদীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এই মঞ্চী। একথা শুনে সত্যচরণ অবাক হন। মঞ্চী তাঁকে এই শীতে ঘাস জ্বেলে আগুন করে দিল একটু তাপ পেতে।

বৃদ্ধার তরুণী স্ত্রী বলেই সে ৮/১০ মণ সর্ষে থেকে তিন মণ খরচ করে তার সব সখের জিনিস কিনেছে। নক্‌ছেদী বলে বোকা মেয়েমানুষ পেয়ে তাকে বিক্রেতারা ঠকিয়েছে। তখন মঞ্চী যে ঠকেনি তা প্রমাণের জন্য একে একে সব এনে সত্যচরণের সামনে সাজিয়ে রাখল।

সত্যচরণ বুঝলেন সরলা বন্য মেয়েটি জিনিসের দাম জানেনা বলেই একে ঠকানো সহজ।

পরদিন সকালে নক্‌ছেদী তার দুই স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে নক্‌ছেদী ও মঞ্চী খাজনা দিতে এল। মঞ্চীর গলায় তার প্রিয় হিংলাজের মালা। ভাদ্রমাসে মকাই কাটতে সে এখানে আসবে, সঙ্গে আনবে হর্তুকির আচার।

সত্যচরণ দুঃখিত হলেন।
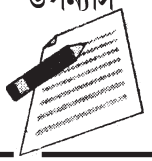
শব্দার্থ ও টীকা

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.12

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১। মঞ্জী কে? অনধিক পাঁচটি বাক্যে তার ছেলেমানুষ প্রকৃতির পরিচয় দিন।

২। মেয়েদের প্রিয় জিনিসের তালিকা সবদেশেই সব সমাজেই অনেকটা এক বলে সত্যচরণ মনে করলেন কেন ?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩। মঞ্জী চলে গেলে সত্যচরণ দুঃখিত হলেন কেন?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে এর কারণ প্রকাশ করুন।

## অনুবিভাগ - 32.4.13

**[ এবার আমার একটা ..... দাঁড়াইয়াছিল রাজবাড়ির দ্বারে। ]**

**বক্তব্যসার:**

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনের-কুড়ি দূরে একটা বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গল কালেক্টরীর নিলামে ডাক হবে খবর পাওয়া গেল। সত্যচরণের কাছে ওই নিলাম ডেকে নেবার নির্দেশ এসেছে। কিন্তু জঙ্গলটা না দেখে নিলাম ডাকতে সত্যচরণ রাজি নয়।

পরের দিন সত্যচরণ রওনা দিলেন। তাঁর লোকজন বাক্স-বিছানা ও জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর আগেই রওনা দিল। বনোয়ারীলালকে সঙ্গে নিয়ে সত্যচরণ চললেন। লোকজনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল কারো নদী পার হবার সময়।

ওখানেই দুপুরের রান্না হল। পুনরায় রওনা হতে একটা বেজে গেল।

এমন সময় দূরে শুক্‌নো কাঠ কুড়োতে গিয়ে একজন কুলি কী একটা নতুন জিনিস দেখে ভয় পেয়েছে। সে জানাল জায়গাটি ভালো নয় ভূত বা পরীর আড্ডা, এখানে তাঁবু না ফেললেই ভালো হত।

বনের মধ্যে কাঁটা-লতা ঝোপের মধ্যে একটা স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই করা। সন্ধ্যায় দেখলে ভয় করে। জানা গেল এরকম খাম্বা রাজার রাজ্যের সীমানা নির্দেশক। এই রাজারা মোগলদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা আর এক রাজা দোবরু পান্না। বয়স তাঁর অনেক, এখন তাঁর কিছুই নেই।

রাজার তিন ছেলে তাঁদের আবার আট-দশটি ছেলেমেয়ে। বৃহৎ পরিবার সব একত্রে থাকে। শিকার ও গোচারণই প্রধান উপজীবিকা। পাহাড়ী জাতিদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের বিচার করলে রাজা কিছু ভেট ও নজরানা পান। এই তাঁর আয়।

বর্শা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শিকার রাজা গ্রহণ করেন না। ভানুমতীর দেওয়া তেল মেখে কাছের
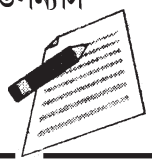
শব্দার্থ ও টীকা

ঝরণা থেকে অতিথিরা স্নান করলেন।

ভানুমতী একটা ধামায় চাল ও মেটে আলু এবং দুধ ও মধু এনে দিল। জগরু কাঁচা শালপাতায় সজারুর মাংস রেখে দিল। সত্যচরণ উনুন ধরাতে না পারায় ভানুমতী পাখির শুকনো বাসা উনুনের মধ্যে পুরে দিয়ে উনুন জ্বেলে দিল। রাজা রান্না ঘরের দুয়ারে বসে থেকে আতিথ্যের যেন কোন ত্রুটি না ঘটে সেদিকে নজর রাখলেন।

রাজা তাঁর পূর্বপুরুষদের বাসস্থান দেখাতে পাহাড়ে উঠলেন, ওখানেই তাঁর বংশের সমাধি স্থান। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁকে সেখানে যেতে হয়।

ওপরে এক বড়ো গর্তের মুখ। ওই গর্তের মুখে কিছুক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে সত্যচরণরা ঢুকলেন। ভয়ানক অন্ধকারে চোখ অন্ধকার হলেও পরে অভ্যস্ত হয়ে যান। প্রকাণ্ড একটা গুহা। গুহার মধ্যে চামসে গন্ধ, বাদুড়ের আড্ডা। এছাড়া শোনা গেল শেয়াল, বনবিড়াল ইত্যাদি এখানে থাকে।

এটাই রাজার পূর্বপুরুষদের দুর্গ-প্রাসাদ।

পাহাড়ের মাথায় এক বড়ো বটগাছ। জুতো খুলে সেখানে যেতে হল। চারিধারে শিলের মতো পাথর ছড়ানো। এটা রাজার বংশের সমাধিস্থান। এই সমাধিক্ষেত্র সত্যচরণের বুকে এক অজানা অনুভূতি জাগাল।

সামনের পাথরে এখন পায়রা ও মুরগি বলি হয়। রাজা জানালেন এটা টাঁড়বারো, বুনো মহিষের দেবতা।

ফেরার সময় ভানুমতী একবাটি দুধ নিয়ে রাজবাড়ির দ্বারে দাঁড়িয়েছিল অতিথিদের বিদায় জানাতে।

**মন্তব্য:**

এই জনজাতিরা প্রকৃতিকে ভালোবেসে তার আশীর্বাদটুকু দুহাত ভরে নিয়েছে। ফলে তারা অকারণে বা ব্যক্তিগত লোভ-লালসায় প্রকৃতিকে লুঠ করেনি। এমনকি তাদের নিজেদের ঐতিহ্যময় শিকার প্রথায় তারা বিজ্ঞান বা আধুনিক প্রযুক্তিকেও ব্যবহার করেনি।

আধুনিক সভ্যতায় 'জোর যার মুলুক তার' নীতিই চলে আসছে। ভালোবাসা- সহানুভূতির বড়ো অভাব এ যুগের সর্বত্র। কিন্তু আদিম এই জনজাতি মহিষদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিয়েছে ; মহিষদের দেবতা টাঁড়বারোকে দেবতা রূপে মেনে নিয়ে তাদের নিজেদের অন্তরের প্রসারতাকেই আমাদের দেখিয়েছে।

রাজা গাছতলার পাথরে বসে গোরু চরাচ্ছেন। এ দৃশ্য রাজ-ঐতিহ্যের সঙ্গে বেমানান। কিন্তু এই দৃশ্য দেখিয়ে দেয় রাজা পরশ্রমজীবী নন। বৃদ্ধ হলেও নিজের শ্রমের ওপর বেঁচে থাকতে চান।

এখানকার রাজপ্রাসাদের সঙ্গে আড়ম্বর ও জাঁকজমকে অন্য রাজপ্রাসাদের তুলনা হয় না ঠিকই

শব্দার্থ ও টীকা

কিন্তু আন্তরিকতায়, মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার যে প্রতিদিনের জীবনধারা চলে আসছে তার তুলনা নেই।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.13

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১। খাম্বা কীসের চিহ্ন?

২। রাজার নাম কী?

৩। তাঁর বর্তমান অবস্থা কেমন?

৪। সত্যচরণ কিছু জিনিস সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে যেতে চেয়েছিলেন কেন?

৫। **অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন:**

(ক) ভানুমতী দেখতে কেমন? তার পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন ছিল?

(খ) রাজার চেহারার বর্ণনা দিন।

(গ) 'বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না'—সত্যচরণ বৃদ্ধের কথা অমান্য করতে পারলেন না কেন?

(ঘ) 'ভানুমতী রাজকন্যা বটে কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা।'—ভানুমতীর অমায়িকতার পরিচয় দিন।

৬। টাঁড়বারো কীসের দেবতা? তিনি কী করেন?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

## অনুবিভাগ - 32.4.14

**[ সেদিন গ্র্যান্ট সাহেবের ..... তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল ]**

**বক্তব্যসার:**

গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের নীচে জমি মাপার কাজের তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন সত্যচরণ। এমন সময় অনেকদিন পরেই দেখতে পেলেন কুন্তাকে। তারপর কুন্তার এখনকার জীবনের কাহিনি শুনলেন আসরফির কাছে। এখন সে থাকে ঝল্লুটোলায় এক গাঙেগাতার বাড়িতে। দু-তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে, ক্ষেত থেকে ফসল কুড়িয়ে কোনোমতে জীবনটা চালিয়ে নেয়।

সত্যচরণের মন বিচলিত হয়ে পড়ে। লবটুলিয়া ও নাঢ়াবইহারের জমি ইজারা নিচ্ছে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা ব্যক্তিরা। কিন্তু কুন্তার মতো নিঃস্ব হতভাগ্য জীবন যাদের—তারা কেন বঞ্চিত হবে। পয়সা
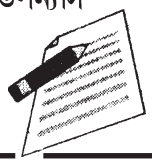
শব্দার্থ ও টীকা

নেই বলে?

আসরফিকে দিয়েই পরদিন কুন্তাকে ডেকে পাঠালেন সত্যচরণ। সত্যচরণের সঙ্কল্প কুন্তার অসহায় জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর করতেই হবে।

বিনা সেলামিতে দশ বিঘে জমি তাকে দিলেন। এবার থেকে চাষ করবে কুন্তা। এজন্য প্রথম দু বছর তাকে খাজনা দিতে হবে না। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিলেই চলবে।

যে কুন্তা রাতে রাতে ক্ষেত থেকে ফসল কুড়িয়ে বেড়ায়—আধ টুকরো কলাই গুঁড়োর ছাতু তার বাচ্চাদের খাওয়ায় আর নিজের সবদিন খাওয়া জোটে না—সেই কুন্তা সত্যচরণের কাছ থেকে দশ বিঘা জমি পেয়ে দিশাহারা হয়ে ওঠে ; বিহ্বলার মতো কেঁদে ফেলে।

**মন্তব্য:**

কুন্তা অভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, দুঃখ-দারিদ্রে ভেঙে পড়েনি। ভিক্ষে করে ছেলেমেয়ে নিয়েই বেঁচে থাকার লড়াই করে খুব অল্প পরিসরে লেখক কুন্তা চরিত্রকে এক আদর্শ নারী চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন। আর সত্যচরণ? সত্যচরণ নিজেই এ গ্রন্থের শেষে আমাদের জানিয়েছেন, ''নিরাশ্রয় কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি, আমার ম্যানেজারী জীবনের ইহা একটি সৎ কাজ।''

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.14

১। কুন্তা কে? তার ছেলেমেয়ে কজন? তার সংসার চলে কীভাবে—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

২। কুন্তার চরিত্র অনধিক পাঁচটি বাক্যে বর্ণনা করুন।

৩। 'কুন্তা বলিল—জী হুজুর মেহেরবান। পরে হঠাৎ বিহ্বলার মতো কাঁদিয়া ফেলিল।'— সে হঠাৎ বিহ্বলার মতো কেঁদে ফেলল কেন?

## অনুবিভাগ - 32.4.15

**[ এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় ..... এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক ]**

**বক্তব্যসার:**

সন্ধ্যের পর বিড়িপাতার জঙ্গলের কাছারিতে পৌঁছলেন সত্যচরণ। এদিকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার এখান থেকে চলে যাবার সময়। তাই শেষ বারের মতো ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা সত্যচরণের প্রবল হল।

পরদিন সকালে পৌঁছলেন তিনি দোবরু পান্নার রাজধানী চকমকিটোলায়। সত্যচরণকে দেখে

ভানুমতী একেবারে আনন্দে আটখানা। প্রায়ই সে ভাবে সত্যচরণের কথা, এমনকি কালও ভেবেছে।

সত্যচরণও যেন ভানুমতীকে দেখছেন নতুন করে। সাঁওতাল মেয়ে সে। কিন্তু তার বেশভূষা, প্রসাধনের পারিপাট্য, সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ—সবকিছুতেই রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ।

বাড়ির সবাই এসে সত্যচরণকে নমস্কার জানাল। ভানুমতীর কাকা, জগরু যার নাম—নবীন যুবক সে। রাজপুত্রের মতোই দেখতে। সত্যচরণ তাকে পছন্দ করেন। এদের আতিথেয়তার এতটুকু ঘাটতি নেই। ভানুমতী তেল এনে দিল—জগরু আন্তরিকভাবেই জানতে চাইল কী খাবেন তিনি—সজারু, হরিয়াল না বন-মোরগ।

খাওয়া দাওয়া শেষে একটু বিশ্রামের পরই ভানুমতীর প্রস্তাব বেড়াতে যাবার। পাহাড়ের পথে চলতে চলতে চারপাশের অজস্র ছাতিম ফুলের সুগন্ধে তাদের মনপ্রাণ যখন ভরে উঠেছে, তখনই সত্যচরণের মনে হল : জীবনটা তার ধন্য। ভানুমতী তো রাজকুমারী বটেই—কিন্তু না তার থেকেও অতিরিক্ত কিছু সে। সত্যচরণ যেন চলেছেন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মূর্তিমতী এক বনদেবীর সঙ্গে। চারপাশে কী সুন্দর ফুলের গন্ধ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, দেখবার জন্য সত্যচরণ একটু বসতে চাইলেন। খানিক পরে দোবরু পান্নার সমাধিতেও ফুল দিয়ে এল তারা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাতাসে ভাসছে তখন শিউলি ফুলের গন্ধ।

**মন্তব্য :**

প্রকৃতি প্রেমিক সত্যচরণ প্রকৃতির রূপেই যে মুগ্ধ—তা নয়। মানুষের প্রতিও তাঁর ভালোবাসার কথা, সহৃদয়তার কথা লেখক প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে। এবং বিস্তৃতভাবেই সেসব কথা লিখেছেন লেখক।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.15

**অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন ঃ**

১। সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে ভানুমতীর তুলনা হয় না কেন ?

২। ভানুমতীর ছোটোকাকা জগরুকে সত্যচরণ অত্যন্ত পছন্দ করেন কেন ?
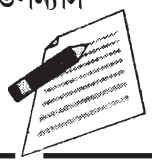
## অনুবিভাগ - 32.4.16

**[ রাত্রে বসিয়া জগরু ..... আর খবর রাখি না ]**

শব্দার্থ ও টীকা

**বক্তব্যসার:**

জগরু পান্নাদের সাংসারিক অবস্থা ভালো নয়। মহাজনের দেনা এখনও শোধ হয়নি, ধার করে কিনতে হয়েছে দুটো মোষ। তারা ঘি বিক্রি করত যে মহাজনের কাছে—তিন-চার মাস ধরে সে না আসাতে ঘি বিক্রিও বন্ধ হয়ে গেছে।

চা খাবার পর বাড়ির অন্যান্যরা ওখান থেকে চলে গেলেও ভানুমতী সত্যচরণের সঙ্গে কথা বলেই চলল। সামান্য অনুযোগের সুরে অনেকদিন পরে আসার কথাও উল্লেখ করল। কাল তার ফেরা হবে না। ঝাটি ঝরনার কাছে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে। চমৎকার জায়গা সেটা। জঙ্গল ভয়ানক। বুনো হাতি, বনময়ূর দেখা যাবে। পৃথিবীর ভেতর সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় সত্যচরণকে নিয়ে যাবার কথা বলে সে।

রাজা দোবরু পান্নার নামে ছ-সাত মাস আগে যে একটা চিঠি এসেছিল—বাড়ির কেউ পড়তে জানে না বলে এতদিন পড়া হয়নি—এখন সত্যচরণকে দিয়ে সেটা পড়িয়ে নিল। পাটনা থেকে এক মহাজনের লেখা সে চিঠিটি। দোবরু পান্নার কাছে জানতে চেয়েছে এখানে বিড়ি পাতার জঙ্গল আছে কিনা, থাকলে কী দরে ইজারা বিক্রি হয়।

ভানুমতীদের বাড়িতে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। সবাই সেদিন যুগলপ্রসাদের রান্না করা খাবারই খেল।

পরদিন কিন্তু সত্যচরণদের ওখান থেকে আসা হল না। ভানুমতী হঠাৎ-ই এসে সত্যচরণের হাত ধরে কাতরভাবে অনুরোধ জানায়—'আজ যেতে দেব না বাবুজী।'

সত্যচরণ ভানুমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। এক অব্যক্ত ব্যথায় বুকটা তার টনটন করে উঠল।

. . . . . .

তারপর ছায়া নিবিড় পথ দিয়ে চলতে চলতে সত্যচরণ কল্পনায় দেখল ভানুমতীর যুবতী মূর্তি যে সাগ্রহ দৃষ্টি নিয়ে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার প্রণয়ীর আগমনের অপেক্ষায়। হয়তো সে পাহাড়ের ওপারের বনে শিকারে গেছে—এই এলো বলে।

সত্যচরণ তখন মনে মনে ওই তরুণীকে প্রাণভরা আশীর্বাদ জানায়।

**মন্তব্য:**

উপন্যাসের এই শেষ অংশে সত্যচরণের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে একটা তীব্র বেদনা। সে বেদনা কেবল লবটুলিয়া থেকে শেষবারের মতো চলে যাবার জন্যই নয়। সে বেদনার কথা স্পষ্ট

হয়েছে—'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।' সত্যচরণের এহেন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ভানুমতীর কাছ থেকে পাওয়া না গেলেও তার মনের একান্ত গোপন সুরটি কিন্তু পাঠকের বুকে না বেজে পারে না।

## পাঠগত প্রশ্ন : 32.16

১। জগরু পান্নাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা কেমন?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

২। আনন্দ ছাড়া জীবনের উন্নতি অর্থহীন কেন? অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

৩। লবটুলিয়া থেকে বিদায় মুহূর্তে সত্যচরণের বুকে এক অব্যক্ত ব্যথা জেগে ছিল কেন?— অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

## 32.5 আপনি যা শিখলেন

1. প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে ও ভালোবাসতে।
2. মানবদরদী হতে।
3. জন্তু-জানোয়ারের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে।
4. দেশ ও জাতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে।

## 32.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

১। প্রকৃতি অথবা মানুষ—এই উপন্যাসে লেখক কাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন দশটি বাক্যে লিখুন।

২। যুগলপ্রসাদের চরিত্রের কোন্ দিকটি আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করে পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩। অরণ্যের প্রকৃত অধিকারী কারা— জনজাতিদের রাজবাড়িতে প্রবেশ করে লেখকের একথা কেন মনে হয়েছিল?

৪। রাজু পাঁড়ে সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য বুঝিয়ে দিন।

শব্দার্থ ও টীকা

## 32.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

### 32.1

১। ক — আ  খ — অ  গ — ই

২। ক) বেকার, মেসে টাকা বাকি

খ) উমেদারি করতে চায় না

### 32.2

১। ক — অ  খ — ই  গ — ই

২। প্রকৃতি ও জমির রূপ বদল

৩। বন্ধু সতীশের বদান্যতায়

### 32.3

১। মুহুরি

২। বর্ধমান

৩। গোষ্ঠবাবু

৪। নির্জনতা, ভাষা না জানা, বই পড়া

### 32.4

১। ক) প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙ,  খ) ছ-আনা

২। সব জায়গায় নেওয়া, ভাত রাঁধা, ভাত খাওয়া, জিনিসপত্র রাখা

৩। নিঃসঙ্গ জীবন

৪। খুবই গরিব

### 32.5

১। ঢোল বাজিয়ে নাচগান করে

২। চিঠি লিখেছেন—রাত একটা

৩। পরীদের বিচরণ ভূমিতে

### 32.6

১। সাপ ও মোষের একসঙ্গে জল খাওয়া

২। ঘোড়াকে জল খাওয়াতে
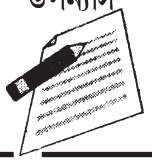
৩। বুনো মোষ দেখা

৪। পিপাসার্ত নীল গাই ও হায়নার একসঙ্গে জলপান—মাঝখানে নীল গাই-এর অসহায় ছোটো বাচ্চা।

## 32.7

১। বই পড়ছিলেন

২। মোষ, চিতাবাঘ, নীলগাই

৩। ভয়ঙ্কর গরম এবং তীব্র পিপাসায়

৪। জঙ্গল ভেঙে ছুটছে

৫। দশ-পনেরো জনের চেষ্টা—গাছের কাঁচা ডাল আর বালি

## 32.8

১। ক — (৩) খ — (১) গ — (২)

২। খ, গ, ঘ

৩। বিষয় সম্পত্তির প্রতি নিস্পৃহতা

৪। ভক্ত, কবি, দার্শনিক, সেবক

## 32.9

১। সত্যচরণ ও সুজন সিং—পূর্ণিয়া

২। বুনো হাতির আশঙ্কায়

## 32.10

১। ক) বন্য ফলের লোভ, বাসা বাঁধার অনুকূল জায়গা, খ) এক হরিণ শিশুর

২। উদাসীন। খুবই গরিব। সৌন্দর্য্যের পূজারি। বনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা।

## 32.11

১। ক) কলাইয়ের ভূষির মধ্যে ঢুকে, খ) মকাই-সেদ্ধ নুন ও শাক

২। সারা বছর বিভিন্ন দেশে ঘুরে ফসল কাটে—যে সময়ের যে ফসল

৩। দশরথ, মুঙ্গের জেলায়

৪। বুড়ো বয়সে বালকের ভঙ্গিতে রং মেখে ময়ূরপাখা মাথায় দিয়ে হেলেদুলে নাচগান

## 32.12

১। নক্‌ছেদী ভকতের স্ত্রী। নাচ—তামাশায় আমোদ। জিনিস কিনতে খুশি—ঠকবে—তবু গর্ব, হাসি।

শব্দার্থ ও টীকা

সত্যচরণকে আচার তৈরি করে খাওয়াতে চায়।

২। লেখকের বোনের পছন্দের জিনিস—মঞ্চির পছন্দও এক। মাথার কাঁটা, লাল ফিতে প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ।

৩। সহজ সরল মেয়ে—হাসিতে খুশিতে প্রাণ চঞ্চল

## 32.13

১। সীমানার নিশানা

২। দোবরু পান্না বীরবর্দী

৩। রাজ্য নেই এখন। বৃদ্ধ, খুব গরিব।

৪। যার যা প্রাপ্য সম্মান তা না দিলে কর্তব্যের হানি হয়। রাজার সঙ্গে দেখা করতে হলে কিছু নজর নিয়ে যাওয়া উচিত।

৫। ক) স্বাস্থ্যবতী, মুখশ্রী লাবণ্যময়। খাটো কাপড় পরনে।

খ) দীর্ঘ। যৌবনে সুপুরুষ। মুখে বুদ্ধির ছাপ।

গ) ওখানে সেদিন থেকে খাওয়া-দাওয়া করার কথা অনুরোধটি আদেশের সামিল বলে।

ঘ) পাখির বাসা দিয়ে আগুন জ্বালালো।

৬। বুনো মোষের দেবতা। মোষের বংশ রক্ষা করেন।

## 32.14

১। কাশীর বাঈজীর মেয়ে। দু-তিনটি। ভিক্ষে করে, ফসল কুড়োয়, কলাই, গম কাটে।

২। আদর্শ নারী চরিত্র। অভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।

৩। সত্যচরণের সদয় হয়ে দশ বিঘা জমি দান। প্রথম দু বছর খাজনা মকুব

## 32.15

১। ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

৩। রাজপুতের মতো চেহারা, রূপ আছে অভিজাত বংশ বলে মনে হয়

## 32.16

১। মহাজনের কাছে ঘি বিক্রি বন্ধ। চরম আর্থিক সংকট।

২। জীবন একঘেয়ে, এক-রঙা অর্থহীন হয় বলে।

৩। অরণ্যপ্রান্তর নষ্ট হওয়া—কুন্তা, ভানুমতী, রাখালবাবুর স্ত্রী, যুগলপ্রসাদ, মঞ্চী প্রভৃতিদের কথা ভেবে।

## 32.8 লেখক পরিচিতি

কাঁচরাপাড়ার মুরাতিপুরগ্রামে মামারবাড়িতে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার বিভূতিভূষণের জন্ম হয়। পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়ের নাম মৃণালিনী। মহানন্দ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, সংস্কৃতে তাঁর প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য ছিল।

নৈহাটির অপর পারে সাগঞ্জ-কেওটার প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিভূতিভূষণের প্রথম বিদ্যারম্ভ। এখানের পাঠ শেষ করে তিনি ১৯০৮ সালে বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৮ সালে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাস করেন। বি.এ. পড়তে পড়তে শ্রীমতী গৌরীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পাঠ চলাকালেই গৌরীদেবীর মৃত্যু হয়।

লেখক ১৯১৯ সালে জাঙ্গীপাড়া মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯২০ সালে কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় আসেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুপারিশে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের চেষ্টায় হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা পান। ১৯২২ সালে কাজে ইস্তফা দিয়ে আবার কলকাতায় আসেন। ১৯২৪ সালে লেখককে ভাগলপুরে পাথুরিয়াঘাটার জমিদারি এস্টেটে সহকারী ম্যানেজার করে পাঠানো হয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত একটানা সেখানে কাজ করেন। 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের প্রেরণা তাঁর এই ভাগলপুরে থেকেই আসে। 'আরণ্যক'-এর পটভূমিও এই ভাগলপুরের জঙ্গল এলাকার নির্জনতা। সেখানকার স্থানিক সৌন্দর্য ও সরল মানুষের জীবনযাত্রা এই বইতে সাহিত্যরূপ পেয়েছে।

১৯৪০ সালে বিভূতিভূষণ রমাদেবীকে বিবাহ করেন। ১৯৪১ সালে খেলাত ঘোষ ইনস্টিউশন ছেড়ে তিনি পাকাপাকিভাবে স্বগ্রাম বারাকপুরে গিয়ে বসবাস করেন। তিনি ঘাটশিলাতেও একটি বাড়ি কিনেছিলেন এবং বছরে কয়েক মাস সেখানেও থাকতেন।

১৯৫০ সালে ১লা নভেম্বর ঘাটশিলাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিভূতিভূষণ ১৯৫০ সালে মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

এই লেখকের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'দুই বাড়ি', 'অনুবর্তন', 'দেবযান' ইত্যাদি লেখাগুলি উল্লেখযোগ্য।

## 32.9 সমধর্মী রচনার উল্লেখ

(১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা '**পথের পাঁচালি**', (২) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের '**পালামৌ**'।